দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের
রথযাত্রা— পৃঃ ২৪

শ্রীশ্রীজগন্নাথ
রূপলীলা— পৃঃ ৩১

৭৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ৮ জুলাই, ২০২৪।। ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৮ জুলাই - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,
Website : www.eswastika.com

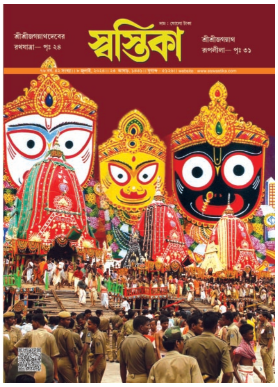

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা, মইয়ে করে উঠে লিফটে করে নামছে তৃণমূল ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দিদির নাটক হাউস ‘ফুল’ ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

কেন জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা ☐ রামবাহাদুর রাই ☐ ৮

তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছিল চীন : ভারতের কূটনৈতিক জবাব ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

হকার উচ্ছেদ : রাজ্য প্রশাসনের দুর্বলতা আড়াল করতে স্বৈরাচারী আচরণ ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব বনাম পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার কৃষি অর্থনীতি দুটি ভিন্ন প্রয়োগ ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ১৩

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে অরুন্ধতী রায়ের ডাহা মিথ্যাকে আউড়ে যাচ্ছে বাম-লিবারেল দেশদ্রোহীরা

☐ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ☐ ১৫

প্রদীপের নীচে অন্ধকার ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ১৭

ওড়িশায় প্রথম সরকারের সৌজন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৮

মহাপ্রভু জগন্নাথ এবং আচার্য শ্রীরামানুজ

☐ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ☐ ২৩

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ☐ প্রদীপ মারিক ☐ ২৪

শ্রীশ্রী জগন্নাথ রূপলীলা ☐ বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৩১

একটি কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান অম্বুবাচী ☐ ড. সর্বাণী চক্রবর্তী ☐ ৩৩

চিরায়ত যাত্রায় ভগবান ভক্তদেরও পথে নামিয়েছেন

☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩৬

রথযাত্রার বিশ্বায়ন ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ৩৭

দুই মহাকাব্যেই অরণ্যের প্রতি রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা

☐ হীরক কর ☐ ৪৩

সাভারকর : এক অদম্য বীরের সংগ্রাম কথা

☐ বাপ্পাদিত্য মাইতি ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ ☐ রঙ্গম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৫০

প্রকাশিত হবে
১৫ জুলাই,
২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ জুলাই,
২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীগুরুপূর্ণিমা

গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক উজ্জ্বল অনুষ্ঠান শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব। গুরুর পদতলে বসে জীবনের সবক্ষেত্রের জ্ঞান লাভ করেছেন ভারত-সন্তানরা। গুরুপদ আশ্রয় করেই ভারত বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গুরু-শিষ্য পরম্পরার বিভিন্ন দিক আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

‘শরীরং রথমেব তু’

কঠোপনিষদে মৃত্যুদেবতা যমরাজ রথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নচিকেতাকে বলিয়াছেন, ‘আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।’ নচিকেতার মাধ্যমে ধর্মরাজ মনুষ্যজাতিকে জানাইয়াছেন যে আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে বল্গা এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ সংসারাশ্রিত মানুষের চেতন বুদ্ধিতে যদি পরমাত্মা বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানুষের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ভারতীয় শাস্ত্রে রথ হইল গতিশীলতার প্রতীক। শরীররূপী রথের যাত্রা আবহমান কাল ধরিয়া মানুষকে দেবত্বের অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, সতত চলমান ব্যক্তিই অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন— চরন্ বৈ মধুবিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্। জীবনের সফলতা নিরন্তর যাত্রার মধ্যেই রহিয়াছে। অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য উপনিষদের নির্দেশ– চরৈবেতি চরৈবেতি। হিন্দিভাষায় ইহার সুন্দর উপমা রহিয়াছে– রমতা সাধু বহতা পানি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রথযাত্রা তাই চিরন্তন চলার প্রতীক, গতির প্রতীক। রথ হইল মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম সোপান। শাস্ত্রে মানব শরীরকে রথের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রথ যেইরূপ শতশত কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, মানব শরীরেও সেইরূপ কয়েকশত অস্থিখণ্ড রহিয়াছে। শরীররূপী রথেও রথী, সারথী, বল্গা ও অশ্ব রহিয়াছে। রথের কাঠামোতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় বিগ্রহ বিরাজমান হইবার পর। সেইরূপ মানব শরীরও সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে অন্তরাত্মা জাগ্রত হইয়া পরার্থে নিবেদিত হইলেই। অর্থাৎ পরমাত্মার প্রকাশ ঘটিলেই। রথরূপী শরীরে পরমেশ্বর যখন সারথী হইবেন, তখনই মানুষের শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিসমূহ ঠিকপথে চালিত হইবে।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখর হইয়া মানুষ রথোপরি প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ দর্শন করিয়া রথের রজ্জু স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। কেননা ‘রথস্থ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।’ বস্তুত, রথযাত্রা শুধুমাত্র প্রভু জগন্নাথ বা ঈশ্বরের যাত্রা নহে– ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই। ভগবান এইদিন নামিয়া আসেন ভক্তবৃন্দের মাঝে। ভক্তির প্রকাশে ভক্ত ও ভগবান একাকার হইয়া রচিত হয় মহামিলন ক্ষেত্র। নরপতি এইদিন স্বয়ং সম্মার্জনী হস্তে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত হন। এইদিন উচ্চ-নীচ নয়, ধনী-দরিদ্র নয়, সকলের পরিচয় তাহারা ভক্ত। এইদিন এক-একটি মেলা প্রাঙ্গণ প্রেমের বৃন্দাবন হইয়া ওঠে। মানুষ এইদিন আমিত্ব বিসর্জন দিয়া শুধুমাত্র ভক্তে পরিণত হন। সেই ভক্তির আস্বাদ পাইতেই প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন করিবার জন্য শ্রীক্ষেত্র পুরীতে এইদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। সমগ্র ভারত যেন এইদিন শ্রীক্ষেত্র হইয়া ওঠে। পশ্চিম-পূর্ব দুই বঙ্গও এদিন রথযাত্রায় মাতিয়া ওঠে।

রথযাত্রা মূলত ভারতবর্ষীয় উৎসব হইলেও বিগত কয়েক বৎসর হইতে রথযাত্রার বিশ্বায়ন ঘটিয়াছে। বিপুল উৎসাহে বিশ্বের দেশে দেশে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সাড়ম্বরে পালিত হইতেছে সানফ্রান্সিসকো, প্রাগ, ডারবান, রোম, মেলবোর্ন, মস্কো, ফ্লোরিডা, লন্ডন ও অকল্যান্ডে। ইহা ব্যতীত শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তো রহিয়াছেই। বিশ্বের এই সকল দেশে রথযাত্রার প্রধান উদ্যোক্তা হইল কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ – ইসকন। বিশ্বের ওই সকল দেশে বসবাসকারী ভারতীয় ব্যতীত মূল নিবাসীরাও সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। তাঁহারাও হরে কৃষ্ণ অথবা জয় জগন্নাথ বলিয়া রথের রজ্জু স্পর্শ করিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। রথ ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভক্তদিগের নয়নে অশ্রু বহিলেও তাহা আনন্দাশ্রু। কেননা, রথ শব্দের অর্থ হইল আনন্দ। ঈশ্বর তো সর্বদা আনন্দময়। রথযাত্রার দিন ভক্তকুলও আনন্দবিহ্বল। বর্তমানে রথযাত্রার শুধু বিশ্বায়নই ঘটে নাই, তাহা সর্বস্পর্শীও হইয়াছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতেই শুধু নহে, রথযাত্রা সামাজিক ও রাষ্ট্রকার্যেও সাধিত হইতেছে। ইহাও সনাতন ধর্মের একটি বিশেষতা।

সুভাষিতম্

সুলভাঃ পুরুষাঃ রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ সত্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।

হে রাজন্, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি সর্বদা সুলভ হয়ে থাকে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যভাষী–এরকম বক্তা ও শ্রোতা দুই-ই দুর্লভ।

সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা
মইয়ে করে উঠে লিফটে করে নামছে তৃণমূল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অনেকের ধারণা সংগঠন দুর্বল বলে রাজ্যে লোকসভা ভোটে আশানুরূপ ফল পায়নি বিজেপি। ধারণাটি ভুল, যদিও তা নিয়ে লেখা বা আলোচনা হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন মজবুত সংগঠন ছাড়াই বিজেপি ৩৯ শতাংশ (বা ২ কোটি ৩৪ লক্ষ) ভোট পেয়েছে। সংগঠন আরও মজবুত হলে বিজেপি অনায়াসেই তৃণমূলকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারবে। কংগ্রেসকে সরাতে বিদেশি বামেদের লেগেছিল ৩০ বছর। বামেদের হঠাতে গিয়ে মমতা তিনটি রাজ্য বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচন হেরেছিলেন। বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির অগ্রগতি মমতার তুলনায় অনেক বেশি। ১৯৯৮-এ দল গঠনের পর তিনটি রাজ্য নির্বাচনে মাত্র ২০.৪ (২০০১), ২৬.৩ (২০০৬) আর ৩৯.০ (২০১১) শতাংশ ভোট পান মমতা।

অথচ উত্থানের পর থেকেই বিজেপি ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ করে ভোট পাচ্ছে। তাই মমতার সঙ্গে বিজেপির অগ্রগতির তুলনা চলে না। বিজেপির পিছিয়ে থাকা সাময়িক। সেই সিঁদুরের মেঘ দেখেছেন বলেই নিজের তৈরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন মমতা। ‘বিজেপি থাকতে এসেছে। যেতে নয়’। ক্ষমতা দখলের সময় মমতার জোরদার সংগঠন ছিল না। ‘ওয়ান ম্যান আর্মি’ হয়েই অধিকাংশ পঞ্চায়েত, পৌরসভা আর লোকসভা আসন জিতেছিল তৃণমূল। তাই রাজনৈতিক বিচারে কেবল বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার সমালোচনা অর্থহীন। ২০১৯-এর পর চার বছর ধরে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটারের বিশ্বাস বিজেপির ভবিষ্যৎ পাথেয়। চুরি, দুর্নীতি করেও তৃণমূল সেই ফাঁক গলে ফোকোটে বিজেপির থেকে এগিয়েছে। মমতার দুর্নীতির জমি উর্বর। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে বিজেপি তাতে ভালোই চাষ করবে। লোকসভা ভোট তার প্রমাণ। শুধু দেখার লাঙ্গলটা কারা আর কীভাবে চালাচ্ছেন।

লোকসভা ভোটে তৃণমূলের এগিয়ে থাকাটা মানুষের মনের প্রতিফলন নয়। কারণ এটা ভীতির ভোট আর জেহাদি ভোট। মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। মমতার অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং বিজেপির ভয়ে বাম জেহাদিরা তাকে জিতিয়েছে। ‘ফিদাইন’ আক্রমণে নিজেকে ধ্বংস করে তারা মমতাকে জিইয়ে রেখেছে। ১৪ আসনে ভোট কেটে বিজেপিকে আটকেছে। এটা জেনে যে তাতে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। জেহাদিদের দয়ায় এই এগিয়ে থাকা নিয়ে মমতার দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠছে। শরীরের দোহাই দিয়ে সব কিছু থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ মৃত্যু পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের কোনো শরীর থাকে না। প্রয়াত তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রায়ই বলতেন ‘আমরা মইতে করে উঠেছি, লিফটে করে নেমে যাব।’ মানে দ্রুত পতন হবে। মেয়র থাকার সময় বলতেন ‘পায়ের নীচে ১০ হাজার ধাঙর। মাথার উপর মমতা’। তাঁর মমতাকে ‘বেদের মেয়ে জোছনা’ আর ‘বাজার করবে ঘুরে ঘুরে, মমতা করবে দূরে দূরে’ উক্তি অমর হয়ে রয়েছে। ১৯৮৬ সালে কসবার রাস্তায় বস্তা চাপা মৃত কুকুরকে কংগ্রেস শহিদ সাজিয়ে সাংসদ মমতাকে বোকা বানিয়েছিলেন এক কংগ্রেস নেতা। ক্ষমতায় এসে মমতা তা না জেনেই তাঁকে মন্ত্রী করেন।

মমতার নাটুকেপনার শেষ নজির ‘হকার উচ্ছেদ আর দুর্নীতির বিরোধ’— যার অস্তিত্ব আছে বলে তিনি এতদিন মানতেন না, কারণ তিনি ওই দুর্নীতির সৃষ্টিকর্তা। কেন কংগ্রেস নেতৃত্ব বা অন্য রাজনৈতিক দল তাকে গুরুত্ব দেয় না তা সহজেই অনুমেয়। আজও তাঁকে খামখেয়ালি আর ভোট কাটুয়া বলেই মনে করে কংগ্রেস। তাঁকে এড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। উপায় নেই তাই অধীর চৌধুরী আর সেলিম-সুজনকে অচ্ছুত করার আবদার রাখতে চিদম্বরমকে মমতার কাছে দূত হিসেবে পাঠায়। মমতা বেজায় ক্ষুব্ধ। কলকাতার ১৪৪-এর মধ্যে ৫২ ওয়ার্ড আর ১২৫টির মধ্যে ৬৯ পৌরসভায় পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। তাদের আট মন্ত্রী হেরেছেন। হকার নেতা শক্তিমান ঘোষের কাঁধে ভর দিয়ে ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে বাম মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর হকার মুক্ত অভিযান ‘অপারেশন সানশাইন’-এর বিরুদ্ধে প্রধান মুখ ছিলেন মমতা। মমতা নীল সাদা শাড়ি পরেন। তবে রাজনৈতিক রং পালটাতেই থাকেন। অনেকের ধারণা রাজনৈতিক প্রয়োজনে ‘অভিষেক বধ’ নাটকেও তাঁর হাত কাঁপবে না। তাতে বিজেপির সুবিধা হবে বটে কিন্তু দিনের আলোর মতো প্রমাণ হবে মইয়ে করে উঠে লিফটে করে নামবে তৃণমূল। □

সুন্দর মৌলিকের চিঠি

দিদির নাটক হাউস ‘ফুল’

সুঅভিনেত্রীষু দিদি,

গত সপ্তাহের চিঠিটা হারিয়ে ফেলেননি তো! আসলে এবার সেই চিঠিরই দ্বিতীয় ভাগ লিখতে হলো। তাই আপনাকে সম্বোধনের ‘বিশেষণ’ বদলালাম না। কেনই-বা বদলাব? আপনি যে সুঅভিনেত্রী এবং মানুষকে সেই অভিনয় ‘খাওয়াতে’ পারেন তা নিয়ে তো কোনও দ্বিমত নেই। হুইল চেয়ার থেকে ক্ষমা চাওয়া সবই করেছেন এবং মানুষ তা যে খেয়েছে তার প্রমাণ গত কয়েকটি নির্বাচনের ফল।

এবার নির্বাচনে আপনার দল ২৯টা আসন পেলেও আপনি জানেন এই জয়ের আড়ালে কাঁটা রয়েছে। শহরাঞ্চলে আপনার দল সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গায় পিছিয়ে। তাই ভোটপর্ব মিটতে না মিটতেই আপনি মঞ্চ সাজিয়ে ফেলেছেন। প্রথমে আপনি মঞ্চস্থ করলেন শহরে যে সব দুর্ভোগ সাধারণকে পোহাতে হয় তার জন্য আপনি মোটেও দায়ী নন। সব দায় কিছু নেতার। তাঁদের ধরে ধরে ‘লাইভ’ প্রশাসনিক বৈঠকে বকাঝকা করেছেন। কে কোথায় টাকা নিয়ে হকার বসিয়েছে তা নিয়ে চোটপাট করেছেন। আবার তে রাত্তির পার হতে না হতেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক মঞ্চস্থ করে ফেলেছেন। তাতে সবার সব দোষ মকুব করে দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তাঘাট হকারমুক্ত করার শপথ থেকে পিছু হটে ‘পুনর্মুষিক ভব’ বলে রায় দিয়ে দিয়েছেন। সবাই ভাবছে আপনি এক মাস সময় দিয়ে সমীক্ষার ফল দেখে পদক্ষেপ করবেন। কিন্তু দিদি, আমি জানি আপনি তা করবেন না। নিউ মার্কেট, ধর্মতলা চত্বরে যাঁরা পথ দখল করে ব্যবসা করেন তাঁদের বেশিরভাগই যে আপনার ভাষায় দুধেল গাই। তাই আপনি হিন্দু হকারদের উচ্ছেদ করলেও মুসলমান মহল্লায় ঢুকবেন না। আসলে আপনি দলের নেতা মন্ত্রীদের যে সমীক্ষা করতে দিয়েছেন সেটা হলো, ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে ফেলা। তাতেই ঠিক হয়ে যাবে কোথায় কাদের উচ্ছেদ হবে আর কাদের নয়।

আসলে আপনি শহরবাসীকে কয়েকদিনের জন্য একটা আমোদ দিলেন। ভোটের পরে সে আমোদ খারাপ লাগেনি। আপনার দৌলতে এই রাজ্যে এখন নিত্যনতুন আমোদ আর উত্তেজনার অভাব নেই। আপনি সহসা প্রবল স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, শহর জুড়ে বিশৃঙ্খলা আর বরদাস্ত নয়। বেআইনি বহুতল, অনুমোদনহীন বিদ্যুৎ সংযোগের মতো অনাচার বন্ধ করতে হবে। রাস্তা দখল করে হকারদের যথেচ্ছ পসার পাতা চলবে না। তার পরেই কয়েকদিন এখানে সেখানে অবৈধ হকার ও অন্য দখলদারদের অপসারণের কাজ শুরু হয়ে গেল। নাগরিকরা ভাবতে শুরু করলেন এবার বুঝি শহরের পথঘাট অন্তত অংশত, হাঁটাচলার উপযোগী হবে। পুলিশ একেবারে বুলডোজার নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ল। সেটা যদিও নাটকেরই অঙ্গ। কারণ, সেটা না করলে আপনি কতটা ‘দয়ালু’ তা প্রমাণ করা যেত না আর নাটকের তৃতীয় অঙ্কও জমত না।

> **পুরসভা, পুলিশ ইত্যাদিকে এক মাস সময় দিয়েছেন। আমি জানি দিদি, এক মাস মানে অনেকটা সময়। তার মধ্যে নতুন নাটক নেমে যাবে। সবাই ভুলে যাবে হকার-উচ্ছেদ পর্ব। আসলে আপনার নাটক সব সময়েই হাউসফুল। মানে গোটা সমাজকে ‘ফুল’ মানে বোকা বানাতে সফল মঞ্চায়ন।**

আবার আপনি একই রকম প্রবলস্বরে ঘোষণা করলেন, ‘নির্দয়’ ভাবে হকার উচ্ছেদ চান না। পুরো কাজটা পরিকল্পনা করে সম্পাদন করতে হবে। সেই সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে আপনি নাটক এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। পুরসভা, পুলিশ ইত্যাদিকে এক মাস সময় দিয়েছেন। আমি জানি দিদি, এক মাস মানে অনেকটা সময়। তার মধ্যে নতুন নাটক নেমে যাবে। সবাই ভুলে যাবে হকার-উচ্ছেদ পর্ব। আসলে আপনার নাটক সব সময়েই হাউসফুল। মানে গোটা সমাজকে ‘ফুল’ মানে বোকা বানাতে সফল মঞ্চায়ন।

অনেকেই বলছেন আপনার এবারের চিত্রনাট্যটি দুর্বল, হাস্যকর এবং কাঁচাও। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে হকার সমস্যা এত পরিব্যাপ্ত এবং এতটাই পুরনো যে, তা নিয়ে ‘আচমকা’ শোরগোল তোলার আড়ালে রাজনীতি ছাড়া কোনও অর্থই নেই। সবাই জানে, এত অনাচার পুরসভা ও পুলিশের চোখের সামনে চলে। তাদের সম্পূর্ণ ‘সহযোগিতা’ ছাড়া সম্ভবই নয়। মাঝে মাঝে আপনার ‘ধমক’ যে আসলে ‘কুনাট্য’ সেটা দিদি সবাই জানে। তবুও নাটক সফল হয়। তবুও আপনি জেতেন। দিদি, এখানেই আপনার সাফল্য আর একটা বড়ো শ্রেণীর বাঙ্গালির ‘অন্ধত্ব’। □

অতিথি কলম

কেন জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা?

রামবাহাদুর রাই

> **প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে বিশন ট্যান্ডন নামে একজন অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁর ডায়রিতে লেখেন, যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ঠিক চিনে ও বুঝে থাকেন তো আর যা কিছু করুন, চেয়ার ছাড়ার পাত্রী তিনি কোনোভাবেই নন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যত খারাপই হোক— যে কোনো কাজ করতে তিনি পিছপা হবেন না, দু'বার ভাববেন না।**
>
> **—১৯৭৫-এর ১২ জুন।**

পুপুল জয়কর ছিলেন সংস্কৃতি জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকটজন। ১৯৭৫ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ হয়। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ বাক্যালাপ চলে। আলোচনা যখন শেষের দিকে তখন তিনি ইন্দিরাকে বলেন যে মেক্সিকোতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে তখন একটি আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের আয়োজন চলছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু ইন্দিরার একটি কথায় জয়কর বেশ অবাক হন। ইন্দিরা গান্ধী জয়করকে বলেন--- 'এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় কী হয় দেখুন'।

অবশেষে এল হাইকোর্টের সেই রায়। সেই রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর রাতের ঘুম উড়ে গেল। প্রায় ৫০ বছর আগের এই ঘটনা। হাইকোর্টের রায়দানের তারিখ ছিল ১৯৭৫ সালের ১২ জুন। এই রায়ের ফলে ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটি নিয়ে সংকট সৃষ্টি হলো। কারণ এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই রায়ে তাঁর লোকসভার সাংসদ পদটিকেই অবৈধ ঘোষণা করে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সেই সময় বিশন ট্যান্ডন নামে একজন অফিসার ছিলেন। তাঁর প্রত্যহ ডায়রি লেখার অভ্যাস ছিল। এই রায়দানের পর তিনি তাঁর ডায়রিতে লেখেন যে যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ঠিক চিনে ও বুঝে থাকেন তো আর যা কিছু করুন, চেয়ার ছাড়ার পাত্রী তিনি কোনোভাবেই নন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যত খারাপই হোক— যে কোনো কাজ করতে তিনি পিছপা হবেন না, দু'বার ভাববেন না। ১৯৭৫-এর ১২ জুন তারিখেই এই কথাগুলি তিনি তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন।

ইন্দিরাকে চিনতে তাঁর যে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। ১৯৭৫-এর ১২ জুন পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৭৫ সালের পর অতিবাহিত হয়েছে অনেকগুলি বছর। এতদিন পরেও ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নটিই আসে যে কেন ইন্দিরা গান্ধী জারি করেছিলেন জরুরি অবস্থা? তাঁর কাছে ১৯৭৫-এর ১২ জুন দিনটি এক নয়, তিন দিক দিয়ে ছিল ধাক্কা ও বিপদ সংকেত। এইদিন সকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ও বিশেষ আস্থাভাজন ডি.পি. ধরের মৃত্যু হয়। যে রায় নিয়ে আগে থেকেই ইন্দিরা চিন্তিত ছিলেন, দুপুরের আগেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই রায় ঘোষিত হয়। রাত্রি নামার আগেই গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস সেই ভোটে পরাজিত হয়, বিরোধী রাজনৈতিক জোট সেই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়।

পরপর আসা এই তিনটি আঘাতকে সহ্য করে ইন্দিরা যদি নিজের মনকে শক্ত করে আগের মতোই প্রশাসনিক কাজে মনোনিবেশ করতেন তাহলে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি হয়তো অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো এর বিপরীত। ১৯৭৫-এর ১২ জুনের পরে ইন্দিরা গান্ধীর গৃহীত পদক্ষেপের কারণ অনুসন্ধান করলে তা হবে স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সব চেয়ে কালো অধ্যায়টি পাঠ করার সমান। যারা এই অন্ধকার অধ্যায় নিয়ে পড়াশোনা বা গবেষণায় আগ্রহী, সেই সময় বা তারপরে প্রকাশিত সমসাময়িক অসংখ্য বই ও পত্রপত্রিকায় ভারতীয় গণতন্ত্রের সেই লজ্জাজনক অধ্যায় সংক্রান্ত তথ্য তারা পাবেন। ১২ জুন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অফিসে (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে) আসেননি। ওই দিন তিনি তাঁর বাসভবনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সম্পর্কিত সংবাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। সকাল ঠিক ১০টা বেজে ৫ মিনিটে বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা রায় ঘোষণা করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সংসদ সদস্য পদ অবৈধ বলে রায় দেন। ৬ বছর ইন্দিরা গান্ধী কোনো নির্বাচন লড়তে পারবেন না বলেও তিনি জানান।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই রায় ইন্দিরার কাছে পারতপক্ষে ছিল একটি লিটমাস টেস্ট। কিন্তু তা কীভাবে ও কেন? ১২ জুনের পরবর্তী ঘটনাক্রম হলো তার প্রমাণ। হাইকোর্টের রায় সামনে আসতেই, ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে লোকজন জড়ো করতে শুরু করে কংগ্রেস। এটি ছিল পরবর্তী ঘটনা কী ঘটতে চলেছে তার সংকেত। রাজধানীর রাস্তায় ইন্দিরার সমর্থনে মুহুর্মুহু স্লোগান চলতে থাকে। সেই স্লোগানের আড়ালে সফদরজঙ্গ রোড-স্থিত প্রধানমন্ত্রী আবাসে ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে

বইপত্র ঘেঁটে আইনি যুক্তিজালের সন্ধান চলতে থাকে।

২০০০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরকে এই প্রতিবেদক প্রশ্ন করে যে— ১৯৭৫ সালের ১২ জুন তারিখে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করে। সেই দিন যদি রায় ঘোষিত না হতো বা রায় ইন্দিরার বিপক্ষে না যেত, তাহলেও কি ইন্দিরা গান্ধী দেশের ওপর জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দিতেন? উত্তরে চন্দ্রশেখর এই প্রতিবেদককে বলেন--- আমি আন্দাজ করেছিলাম যে ইন্দিরা গান্ধী কোনো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করে চলেছেন। এর নানারকম আভাসও পাওয়া যাচ্ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের হরিয়ানায় যাওয়ার কথা ছিল। সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল বলেছিলেন যে জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেফতার করা হতে পারে। বংশীলালের এই মন্তব্য ছিল ইন্দিরা গান্ধীর অভিপ্রায় ও অভিসন্ধির একটি অন্যতম সংকেত। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হতে এই ঘটনাক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই প্রতিবেদককে বলা তাঁর বক্তব্যে সেই সময়ের একটি ইতিহাস গ্রথিত রয়েছে ।

জরুরি অবস্থার জারির সেই অধ্যায়ের পরে চন্দ্রশেখর দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এছাড়াও আরেকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়, তখন তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্যসমিতির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর নির্বাচনের ও সদস্যপদের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সেই রকম একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক যখন বলেন যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের পর সেই সময়ের ঘটনাক্রম অন্য দিকে বাঁক নেয়, তখন ইতিহাসের সেই মোড় ঘোরার পিছনে ইন্দিরার কোন চিন্তাধারা ক্রিয়াশীল ছিল, তা জানা বিশেষ জরুরি। কারণ এই ইতিহাস সেই সময়ে ইন্দিরার চিন্তাভাবনার চড়াই-উতরাইয়ের সন্ধান দিয়ে যায়। গুজরাটের সঙ্গেও এই ঘটনাক্রমের সংযোগ রয়েছে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চিমনভাই প্যাটেল। ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। গুজরাট জুড়ে নবনির্মাণ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে ইন্দিরার ইশারায় ও সমর্থনে সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজ শুরু হয়। দেখতে দেখতে এই আগুন যেন একটি দাবানলে পরিণত হলো। এই আন্দোলনের বলি হলো ১০৩ জন। ৩০০ জনেরও বেশি আহত হন। আট হাজার লোক কারাবন্দি হলেন। রাজ্যের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি দেখে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবিতে দিল্লিতে মোরারজী দেশাই আমরণ অনশন শুরু করলেন। তাঁর মত ছিল যে রাজ্যের মানুষের আস্থা ও ভরসা হারিয়েছে এই বিধানসভা। এই অনশন চলাকালীন চন্দ্রশেখর ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন যাতে মোরারজী দেশাইয়ের দাবি ইন্দিরা মেনে নেন। সেই চাপে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। গুজরাটে নির্বাচন সংঘটিত হয়। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়।

এই তিন ঘটনাপ্রবাহের মেলবন্ধনের পরিণাম হলো ১৯৭৫ সালের ১২ জুন দিনটি। এই তিনটি কারণে ইতিহাসে এই দিনটি নথিভুক্ত রয়েছে। তিনটি ঘটনাক্রমের মধ্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়টিই রাজনৈতিক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা হয়তো মনে করেছিলেন যে প্রশাসনিক শক্তি এবং সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে সংবিধানের অপব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী দানা বাঁধা প্রবল অসন্তোষকে তিনি দমন করবেন। এই সময়তেই জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন তুঙ্গ সীমায় ওঠে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হচ্ছিল রেল ধর্মঘট। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটি অসুরক্ষিত — ইন্দিরার এই ভাবনা ও আশঙ্কা থেকেই উদ্ভূত হয় তাঁর এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পদদলিত করার মানসিকতা। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হতেই প্রধানমন্ত্রীর সফদরজঙ্গ রোডের আবাসে সবার প্রথমে পৌঁছন কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া। তাঁর আসার পরেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং এইচ.আর. গোখলে সেখানে পৌঁছে যান। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আইনি পরামর্শের জন্য তাঁকে দিল্লিতে আগেই ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এইচ.আর. গোখলে তখন কেন্দ্রে আইনমন্ত্রী ছিলেন।

ইন্দিরা সেই সময় কী ভাবছিলেন সেই বিষয়ে নানারকম কাহিনি চালু রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হলো তা ছিল কল্পনাতীত। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়। ওই বছরেরই ২৪ জুন সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ইন্দিরাকে বিশেষ স্বস্তি তো দিলই না। সেই রায়ে উলটে তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদটি বাঁচানোই সংকট হয়। তার পরের দিনই নিরঙ্কুশ শাসন ও ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে রাস্তা খোঁজা শুরু করেন ইন্দিরা। সুপ্রিম কোর্টের রায় তাঁকে এনে দেখালেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ওইদিনই প্রায় রাত ১২টায় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জরুরি অবস্থার জারির সরকারি আদেশনামায় সই করেন। কিন্তু ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভার অনুমোদন ছাড়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছিল অসম্ভব। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা ছিল আবশ্যক। এই কারণে ২৫ জুন ভোরেই মন্ত্রীদের ঘুম ভাঙানো হলো। তাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লাগোয়া ১ আকবর রোডের ঠিকানায় পৌঁছনোর নির্দেশ যায়। সেখানে সব মন্ত্রীরা একবাক্যে, সমস্বরে জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্তে তাঁদের সায় দেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিংহ ইন্দিরাকে প্রশ্ন করেন যে— ম্যাডাম, এই আদেশ জারির কী প্রয়োজন? এর উত্তরে ইন্দিরা নিরুত্তর ছিলেন। কারণ ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থে এবং নিরঙ্কুশ শাসন কায়েমের জন্য তাঁর চটজলদি জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তড়িঘড়ি দেশের ওপর ভারতীয় গণতন্ত্রের এই অন্ধকার অধ্যায়টিকে জবরদস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে দিল্লির রামলীলা ময়দানের একটি জনসভায় বিরাট জনসমুদ্রের উদ্দেশে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রহিতে এই দেশের সব বিরোধী পক্ষের একজোট হওয়া জরুরি। তা সম্ভব না হলে দেশে অচিরেই একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার পরিণামে দেশের জনতা গভীর দুঃখে ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হবে।

(লেখক ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কলা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ)

তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছিল চীন : ভারতের কূটনৈতিক জবাব

তিস্তার জলবণ্টন ইস্যু নিয়ে সম্প্রতি ব্রিটিশ দৈনিক নিউ এজ একটি খবর পরিবেশন করেছে। খবরের শিরোনামটি ছিল— 'চীনা-ইন্ডিয়া ইন টাগ অব ওয়ার ওভার তিস্তা প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ'। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চীন ও ভারতের যুদ্ধকালীন টানাপোড়েন'। এই খবরটি নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা বিবিসি-ও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিস্তা নদী পুনরুদ্ধার এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের জন্য ভারতের সর্বশেষ প্রস্তাব এবং চীন ইতিমধ্যে একই প্রকল্পের জন্য আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রস্তাব দেওয়ায় বেজিং এবং নয়াদিল্লির মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরের সময় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বিষয়টি উঠে এসেছিল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চীনের মন্ত্রীর সাক্ষাৎও হয়েছে। শেখ হাসিনার দিল্লি সফরের আগে, ভারত-বাংলাদেশের প্রস্তাবিত তিস্তা নদীর ব্যাপক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যেখানে চীন ইতিমধ্যে একশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করে প্রকল্পের জন্য একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা ইতিমধ্যেই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বেজিঙের সমর্থন চেয়েছে। তবে বাংলাদেশ-ভারতের সঙ্গে তার ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনা করবে।

গত ২২ জুন নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্বিপা৭িক বৈঠকের পরে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিস্তার সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের প্রকল্পে সহায়তার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাবে নয়াদিল্লি। আর এই বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর ঘোষণাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। কারণ এই প্রকল্পের ওপর যেমন চীনের নেকনজর রয়েছে, তেমনি তারা বড়ো অঙ্কের টাকাও বিনিয়োগ করছে।

উভয় সংবাদের প্রতিবেদনেই ভারতের প্রতি শ্লেষ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লি দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে টালবাহানার কারণে বাংলাদেশের দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, ভারতের দিকের স্রোতে একতরফাভাবে জল প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা প্রায় শুকিয়ে যায়, এতে বর্ষাকালে যখন নদী উপচে পড়ে, তখন বাংলাদেশে ঘন ঘন বন্যাসমস্যা দেখা দেয়।

কেননা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রায়ই জলের চাপ বন্ধ করার জন্য গাজলডোবা ব্যারেজে ফ্লাডগেট খুলে দেয় বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। একে নিছক নিউ এজ বা বিবিসির খবর হিসেবে দেখতে নারাজ কূটনৈতিক মহল। তাঁরা এই রটনার পেছনে চীনের হাত ও বাংলাদেশি জনগণের মনোভাবই প্রতিফলিত হতে দেখছেন বরং। সুতরাং বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক দৌত্য ব্যতীত নয়াদিল্লির সামনে আর কোনো পথ ছিল না বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

নাম গোপন রাখার শর্তে আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, তিস্তার ড্রেজিং ও উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ সরকার যে পরিকল্পনা করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই প্রকল্প ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল চীন। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাব জমা দিয়েছে বেজিং। যদিও কোনও চীনা সংস্থাকে সেই প্রকল্পের বরাত দেওয়ার বিষয়ে ঢাকার কাছে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল নয়াদিল্লি। কূটনীতিকদের মতে, ভারতের ঘোষণায় হাতে অস্ত্র পাবেন হাসিনা। চলতি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা আবার চীনে যেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, তিস্তার প্রকল্প নিয়ে চীন যে চাপ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে, সেটা ভারতের ঘোষণার ফলে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন হাসিনা। তিনি অনেকটা খোলামেলাও থাকতে পারবেন।

বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত দিয়েও, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে বয়ে গিয়েছে তিস্তা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী, তাই তিস্তা জলবণ্টন চুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই চুক্তি কিন্তু কোনো মামুলি চুক্তি নয়, এর সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সামরিক বিষয় ও কূটনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে। কিন্তু এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের ধুয়ো তুলছেন। এই চুক্তি হলে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কোনো ক্ষতি হবে না।

কিন্তু এতে বাধা দিলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হবে। বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক অবদুল কাদের স্পষ্টই বলেছেন, তিস্তার পানির জন্য মূল সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির সরকার। সবমিলিয়ে এতে করে ভারতের কূটনৈতিক ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কূটনৈতিক মহলের বক্তব্য, চীনের কোনও সংস্থা যদি তিস্তা নদীর সংরক্ষণের প্রকল্পের বরাত পায়, তাহলে নদীর গতিপ্রবাহ-সহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে বেজিং। যে অভিযোগটা চীনের বিরুদ্ধে ভারত মহাসাগরের ক্ষেত্রেও ওঠে। শুধু তাই নয়, তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা, তিস্তা সংরক্ষণ প্রকল্পের দোহাই দিয়ে 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরের (ছোটো ভূখণ্ড, যা ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতকে যুক্ত করেছে) কাছে সামরিক ছাউনি তৈরি করতে সক্ষম হবে বেজিং। তারা মোতায়েন করে রাখতে পারে সেনা। যা ভারতের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক হতো বলে মত কূটনৈতিক মহলের। □

হকার উচ্ছেদ : রাজ্য প্রশাসনের দুর্বলতা আড়াল করতে স্বৈরাচারী আচরণ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

গত ২৪ জুন, গোটা রাজ্য জুড়ে হুলুস্থুলু খবর। সবাই টের পেল হ্যাঁ নির্বাচনটা শেষ হলো বটে। কারণ উচ্ছেদ অভিযান চলছে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। মুখ্যমন্ত্রী তোপ হেনেছেন পুর কর্তৃপক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসন সবার ওপর। পুলিশের এবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনতে হবে, মুখ্যমন্ত্রী খুশি নন বলে কথা! ২৬ তারিখ খবরের পর খবর, কলকাতা-সহ আরও নানান প্রান্তে চলছে হকার উচ্ছেদ। তারপরেই হঠাৎ বুলডোজারের লম্ফঝম্প থামল। ২৪ জুন হকার হটাও-এর সুর নরম হলো মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই। ঠিক হলো একমাস সময়, তার মধ্যেই বেআইনি হকারদের সমাধান সূত্র চাই।

হকার উচ্ছেদ কলকাতার বুকে এক রাজনৈতিক নাটক, লোক দেখানো তামাশা এবং রাজনৈতিক দাদাদের মদতে এক দল হকার সরিয়ে অন্য হকার দলকে আনার কৌশল। কলকাতার হকার সমস্যা কতটা ঝঞ্ঝাটের তার টাটকা উদাহরণ গ্রান্ড হোটেল ফুটপাতের বেআইনি হকার জট। ঐতিহ্যবাহী গ্রান্ড হোটেলকে যেন গ্রাস করছে অবৈধ হকারের চিৎকার, মালপত্রের ঢিপি। পথচারীদের চলাটাও দায়। হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরসভাকে বলতে বলতে ক্লান্ত। শেষমেশ তারা কলকাতা শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হলো। বিচারপতি অমৃতা সিনহা হোটেলের সামনে থেকে হকার সরাতে নির্দেশ দেন।

তারপর কলকাতা টাউন ভেন্ডিং কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিনহা। দিন যায়। মাস যায়। শুনানি আসে যায়। দৃশ্য কিন্তু একই থাকল। আরও মজার কথা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর শুনানিতে পুরসভা ওই গ্রান্ড হোটেলের মামলায় নিষ্পাপ শিশুর মতো বলল— হকাররা কোথা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন তা তারা জানেন না! অমৃতা সিনহা সেই তথ্য জানার জন্য সিইএসসি-কে বলেন এবং পুরসভাকে ফুটপাথ খালি করতেও বললেন। তারপর ডিসেম্বর মাস এল, বিচারপতির নির্দেশে পুলিশ, পুরকর্তা টাউন ভেন্ডিং কমিটির সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন ফুটপাথের তিন ভাগের ২ ভাগ খালি থাকবে, ১ ভাগে হকাররা বসবে। হলুদ দাগ কেটে চিহ্নিত হলো তারা কোথায় বসবেন। তারপর? তারপর ক'বার পুরসভার দিক থেকে পর্যবেক্ষণ হয়েছে? ক'বার পুলিশ প্রশাসন টহল দিল? গ্রান্ড হোটেলের ঘটনা তাই উদাহরণ হিসেবে তোলাই যায়।

এই দৃশ্য, এই হকার, অবৈধ দোকানের বাড়বাড়ন্ত কলকাতার কোথায় নেই! যে নিউ মার্কেট আমাদের বাঙ্গালিদের সিগনেচারি সিম্বল ছিল, যে নিউ মার্কেট বলতে জানতাম আনকোরা দোকান, হালফিলের ফ্যাশন আর আভিজাত্যের মিলমিশ, সেই নিউ মার্কেট আজ অভিজাত শৌখিন অধিকাংশ বাঙ্গালির কাছে আতঙ্ক। আতঙ্ক কারণ উর্দুভাষী আরবি শব্দ ভরা অবৈধ হকার আর তাদের নিউ মার্কেট জোড়া বাড়বাড়ন্তের চোটে। কলকাতার এই সমস্যা এক ক্রনিক রূপ ধারণ করেছে। নিউ মার্কেট থেকে শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট থেকে শিয়ালদহ কোথায় নেই অবৈধ হকার এবং তাদের ইচ্ছেমত ফুটপাত দখলের ছবি। কখনও শুনছি গড়িয়াহাটে জাল স্লিপ দিয়ে চলেছে রমরমিয়ে বেআইনি পার্কিং। যার একটা অংশ টাকা যায় দাদার কাছে। একই অঙ্ক, রসায়ন সবটাই হকারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এও তো ঠিক তারা রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক, চাঁদা (পড়ুন তোলা) দেয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন করে। দোকানে সেই রাজনৈতিক দলের স্টিকার, পতাকাও ঝুলছে। বছরের পর বছর ধরে চলছিল রুজি রুটির লড়াই। ওই ফুটপাতেই। ওরা ধরেই নিয়েছিল প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা সবাই ওদের অনুমোদন করে, কারণ ওদের মতদতেই তো দোকানটা আছে।

তারপর একদিন সকালে মমতা ব্যানার্জির আচমকাই বোধোদয় হবে, তিনি নির্দেশ দেবেন কেউ নিজের নিজের লোক বসাবে না, পুলিশ সক্রিয় হবে। তাগিদের ঝড় উঠবে কলকাতাকে এক রাতে লন্ডন বানানোর জন্য। এ তো অমানবিক তুঘলকি পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হকার ছাড়াও কলকাতার পক্ষে চলা মুশকিল। সাধারণ ক্রেতারা হকারকেই ভাই বলে একটু দর করে দুটো গল্প করে জিনিস কেনে। কলেজের টাকা জমিয়ে নেলপালিশ ক্লিপ হোক আর পয়লা বৈশাখে বালিশের জামা, আমরা কি সত্যিই হকার ছাড়া ভাবতে পারি? এই বাস্তব জানার পরেও তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত প্রশাসন হকার পদ্ধতির সহজীকরণে কোনো সদর্থক ভূমিকা গত ১৩ বছরে নিয়েছেনো বলে জানা যায়নি। কলকাতার হকার এখনও যেমন সিঙ্গেল ইউজ প্লাসটিক ব্যবহার বন্ধ করতে পারেনি ঠিক তেমনই অবৈধ শেড, ফুটপাত দখল এবং বহু সময়েই তাদের বেআইনি নানান ব্যবসায়িক আচরণ থেকে নিবৃতি হতে পারেনি। তাই আজ মমতা ব্যানার্জির আচমকাই অত্যুৎসাহী হকার উদ্ধেদে। তার ওপর নির্বাচন শেষ। তাই প্রশাসনিক ভালো মানুষির এইতো সুবর্ণ সুযোগ। কলকাতা নিউ মার্কেটের হকার সমস্যা কি আজকের?

পশ্চিমবঙ্গের কর্ম সংস্থান তলানিতে। শিক্ষিত যুবকরাও অনেক সময়ই হকার হচ্ছেন। রাস্তা, ফুটপাত চওড়া করার

পরিকল্পনা কর্পোরেশনের কোথায়! সেটা হলেও হকারদের খানিক পুনর্বাসন করা যেত। ফুটপাত চওড়া করলে আবার রাস্তার পরিসর কমবে, ফলে গাড়ি চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হবে। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশ ছিল কলকাতা পুর ভবনের আশপাশ থেকে হকার সরিয়ে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করার। পুরসভার আধিকারিক নিজেই স্বীকার করেন নিউ মার্কেটের যে ফুটপাত তা চওড়ায় পাঁচ ফুটের কম, তাই আইনত হকার বসতে পারে না। তারপর কথা উঠেছিল টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে যেখানে পুলিশের পক্ষ থেকে একবার বলা হয়েছিল, পিচ রাস্তার ওপর হকার বসার জন্য আলাদা মার্কিং করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব আইনের চোখে টেকেনি। এদিকে নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সংগঠন হকারদের এই বাড়বাড়ন্তে অসন্তোষের প্রকাশ করেছে বারবার।

২০১৫-তে নিউ মার্কেটের ৫ হাজার ব্যবসায়ী হকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৭২ ঘণ্টা টানা দোকান বন্ধ রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ করে। তৎকালীন মেয়র শোভন চ্যাটার্জি বিষয়টি গুরুত্ব দিলেও পরে আবার জল থিতিয়ে যায়। জয়েন্ট ট্রেডার্স ফোরাম নামক ব্যানারের তলায় ব্যবসায়ীক মহল বহুবার আর্জি করেছিল এই অবৈধ হকার সমস্যার সমাধানের, কারণ লক ডাউনের পর কর্মসংকট এবং তাতে হকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেল কলকাতাতে। তখনও প্রশাসনিক কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সকল শোরগোলের মধ্যেই হকার নেতা সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ দাবি করছেন, '২৬৫ কোটি টাকার ড্রেনেজ হয় হকারদের। বছরে ২৬৫ কোটি টাকা তোলা ওঠে'। এই তোলাবাজির বেশিরভাগই আসে কলকাতার থেকে, বাকি কিছু শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোলের থেকে। এবং ওই নেতার কথায় একই সুর—পুলিশ না চাইলে পিচ রাস্তায় একটাও হকার বসতে পারে না। ইউনিয়ন, পুলিশ সব কোথায় যেন মিলেমিশে এক। হকার বসাতে, হকার তুলতে সবেতেই টাকার খেলা। এর সঙ্গে দৈনিক তোলা। পুরো বিষয়টাই ওপেন সিক্রেট! মানুষের ক্ষোভ ছিল, ব্যবসায়িক মহল বিক্ষুব্ধ। এখন কী করবেন মমতা ব্যানার্জি! ভাববার বিষয়। পুরসভা তাঁর। পুলিশ তাঁর। প্রশাসন তাঁর। একটা বকাঝকা চমক করতেই হলো। প্রশাসনিক বৈঠকে একটু ধমক, একটু তিক্ত ভাষণ অর্ডারে এমন একটা ভনিতা হলো যেন কত প্রচেষ্টাই না চলছে লন্ডন বানানোর।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কী ভুলে গেলেন ২০১৫-তে তিনিই হকারদের বৈধতা দেওয়ার পাশাপাশি শংসাপত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন? সেদিন প্রায় ৬১ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে ৫৯ হাজার আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। তারপর এতগুলো বছর হকার শংসাপত্র দেওয়ার কাজটাই করে উঠতে পারছে না প্রশাসন। তার ওপর ২০২২-এ শহরের বড়ো তিনটি বাজারে হকার সমীক্ষার পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়। বলা হয়েছিল ফুটপাত মেপে এক তৃতীয়াংশ জায়গা হকারদের জন্য রেখে বাকিটা দখলমুক্ত করা হবে। তারপর সম্পূর্ণ হবে শংসাপত্র দেওয়ার কাজ। কিন্তু ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারির পরেও সমীক্ষার আর শেষ হয়নি। যত হকারের নাম নথিভুক্ত হচ্ছে তাদের মধ্যে আবার যারা ২০১৫-তে আবেদন করেছেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু নথিভুক্তদের মধ্যে পুরনো কাগজ খুব কম জনেরই আছে। তাই কে শংসাপত্র পাবে, আর কে পাবে না তাও এক জটিলতার বিষয়। হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা, ২০১৪-র পথ বিক্রেতা (জীবিকা সুরক্ষা ও পথ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী, শহরের আড়াই শতাংশ জনতা হকারি করবেন বলে ধরে নিয়ে শহর পরিকল্পনা করার কথাও উল্লেখ করছেন। তাই ওই নিয়মানুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই হকার সংখ্যা অতিক্রম করে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হকারকেই অবৈধ বলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এই প্রশ্ন উঠলে তিনি বিরক্ত হবেন, কারণ যত প্রশ্ন উঠবে তত তিনি বিব্রত হবেন এবং ধমক বাড়বে কিন্তু সমাধান আরও কয়েক মাইল সরবে।

আবার ১৯৮০-র কলকাতা পুর আইনের ৩৭১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাস্তা ও ফুটপাতে বাধা সৃষ্টিকারী স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনও কাঠামোয় নিষেধাজ্ঞা জারি এবং প্রয়োজন মতো তা ভেঙে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা পুর কমিশনারের আছে। কলকাতাতে কিছু বছর আগে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর ঘোষণা করে পুরসভা বলেছিল ফুটপাতে জবরদখল দেখলেই সংশ্লিষ্ট বরো ইঞ্জিনিয়ারকে পুলিশ অভিযোগ করবে। তা জানাতে হবে বরো চেয়ার পার্সন-সহ মেয়রকে। উচ্ছেদ কাজ করে জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর, তাই তাদেরকেও বলতে হবে। এই পদক্ষেপ না নিলে সংশ্লিষ্ট বরো ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুরুতেই বিড়াল মারতে পারেনি কলকাতার অতি রাজনীতি লালিত প্রশাসন।

কলকাতার হকার এক আবেগের নাম। উচ্ছেদ অভিযান, তোলাবাজি, এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করে থেকে যায় হকার-কবি মোহন দাসের মতো মানুষ। মোহনদাকে চেনন? কলকাতার গড়িয়াহাটে মোহনদার স্টল। বই গুমটি। গুমটিটা যেন এক সমুদ্র। হরেক বইয়ের আসর। বই ভালোবাসে বই হকারি। দোকানে শিব দুগ্গার ছবিতে মোহনদার কী সুন্দর সুন্দর সব কবিতা। হকার টানাপোড়েনে ব্যবসা আর চলছে কোথায়! তবু যে বই। তাই বন্ধ করবে কোন জোরে। আমরা মোহনদার মতো হকারদের জন্য আজকেও কলকাতা শহরের অনেক সমস্যা অনেক বিরক্তিকে দূরে রাখি। হকার কোনো সমস্যাই নয়। ওতো আমাদের সম্পর্ক। হকার কোথায় কীভাবে বসবে তার রূপরেখা তৈরির জন্য যে প্রশাসনিক জোর পরিকাঠামো, পরিকল্পনাবোধ দরকার, তার কতটুকু ইচ্ছে আছে এই শহরের এই প্রশাসনের?

মমতা ব্যানার্জি জানেন তাঁর প্রশাসন কতটা শিথিল। নড়বড়ে। একপেশে। ফাঁকিবাজ। দলদাস। তাই ইউ টার্ন নিতেই হলো। সুর নরম করতেই হলো। সময় দিলেন একমাস। সময়টা সত্যিই ইতিবাচক সুরাহা দেখাবে কি! আমরা খুব সন্দিহান, কারণ মমতা ব্যানার্জি প্রশাসনের ট্রাক রেকর্ড বারবার তিরস্কার আর জনগণের বিরক্তিই অর্জন করেছে। ঝাঁপি বন্ধ করলে তাও এরকম জোর জুলুম। ঝাঁপি খোলার প্রশাসনিক নির্দিষ্ট উপায় যারা দেখাতে পারেনি, তারা বলপূর্বক ঝাঁপি বন্ধ করার হুকুম যখন দেয়, তখন তা স্বৈরাচারী আচরণ। □

পঞ্জাবের সবুজ বিপ্লব বনাম পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার

কৃষি অর্থনীতির দুটি ভিন্ন প্রয়োগ

এক দেশ। দুই রাজ্য। দুই রাজ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজকে বেগ দিয়েছে। দুই রাজ্যই দেশভাগের ফল ভুগেছে। কিন্তু একটি রাজ্য সঠিক অর্থনৈতিক পথ অবলম্বন করে কৃষি কাজের মাধ্যমেই ধনী হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের কানাডা-আমেরিকা পাঠিয়েছে। বড়ো বড়ো ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। দ্বিতীয়টি ভুল আবেগে, ভুল অর্থব্যবস্থা অবলম্বন শুধু করেনি, নিজের রাজ্যকে এক ভুল অর্থনীতির পরীক্ষাগারের গিনিপিগ বানিয়ে তাকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিয়েছে।

সুদীপ্ত গুহ

কৃষি আন্দোলনে সিপিএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস অনেক কথা বললেও, কেন পশ্চিমবঙ্গের কোনো কৃষককে দিল্লিতে বা কলকাতার শহিদ মিনারে এনে প্রতিবাদ করানো হলো না, তার পিছনে আছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দুই রাজ্যের কৃষিঅর্থনীতির দুই ভিন্ন পথ এবং তাঁদের সাফল্য/ব্যর্থতা। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রথম কৃষি, পশুপালন, ডেয়ারির উপর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে, যা পরবর্তীকালে অনুকরণ করে সারা দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গকেই ছাড়িয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, কেন সবার আগে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ শুরু করেও, আমাদের রাজ্যের কৃষকরা জমি ফেলে অন্য রাজ্যে নির্মাণশ্রমিকের কাজে যায়? হরিণঘাটা তো দেশকে দুগ্ধপ্রকল্প বানাতে শিখেয়েছে? তাহলে কেন আজ রাজ্যের সবার বাড়িতে আমুলের দুধ? কেন জলের অভাবযুক্ত রাজ্য অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা আমাদের চিকেনের দ্বিগুণ দামে মাছ বেচে চলেছে? না, রাজনৈতিক আলোচনা করবো না। এই নিবন্ধ সম্পূর্ণ অর্থনীতির। আমাদের অর্থনীতির কোন ভুল চিন্তা আমাদের পিছিয়ে নিয়ে গেছে এবং কীভাবে পঞ্জাব এগিয়ে গেল? আজকের আলোচনা কৃষি। পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ হবে পশুপালন দুগ্ধপ্রকল্প, মৎসচাষ এবং শিল্প বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে।

ষাটের দশকের কৃষি উন্নয়নের তৎকালীন ভারত সরকার ভাগ হয়ে যাওয়া দুই রাজ্যের জন্য দুটি ভিন্ন কৃষি অর্থনীতির পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা দুই রাজ্যের মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়েই হয়েছে। পঞ্জাবে পরিকল্পনা করা হয় সেচের উন্নতি, উন্নত বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং অটোমেশনকে কাজে লাগিয়ে ফসলের মান, পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং সঠিক বিপণন বিষয়ে। সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ ফসল কিনে নেবে কেন্দ্র সরকার। সেই সময় খাদ্যের জন্য (বিশেষ করে গম) আমরা বিদেশের উপর নির্ভর করতাম। বিশেষ করে আমেরিকার কাছে। আমাদের নিজস্ব উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন থেকে যে পরিমাণ গম আসতো, তাতে আমাদের আমেরিকার কাছে নির্ভরশীল থাকতে হতো। ফলে স্বাধীন হয়েও পররাষ্ট্রনীতিতে বার বার ধাক্কা খাচ্ছিল ভারত। সেই সময় ভারত জোট নিরপেক্ষ বলে দাবি করলেও, সোভিয়েত লবির দিকে যাওয়ার প্রবণতাই বেশি ছিল। আর তারই প্রয়োজনে ছিল এই সবুজ বিপ্লব। তাছাড়া আত্মনির্ভর তো হতেই হবে? কিন্তু সমস্যা হলো, এই সবুজ বিপ্লব যদি সারা দেশে হয়, তবে সারা দেশের সব ফসল কিনে নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই আড়াইটা রাজ্য থেকেই ফসল কিনে নেবার পরিকল্পনা শুরু। সঙ্গে এদের সার, বীজ, প্রযুক্তি ও যন্ত্র দিয়ে কেন্দ্র সম্পূর্ণ সমর্থন দেওয়া শুরু করলো। কিন্তু বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের ফলন তো পঞ্জাবের থেকে তখন বেশি? তাহলে এখানে কেন এই পরিকল্পনা করা হলো না? আর তার

বদলে এখানে কী হলো? বাকি রাজ্যে শুরু হলো নাকের বদলে নরুন দেওয়ার খেলা। আর এই খেলার নাম ভূমি সংস্কার। সোভিয়েত রাশিয়া-সহ প্রতিটি দেশের শাসকরাও মেতে ওঠে ভূমি সংস্কারে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেটা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৯ সালে আদি কংগ্রেস ভেঙ্গে অতুল্য ঘোষের পতনের পর ভূমি সংস্কার দ্রুতগামী হয়। এর ফলে সরকারের কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক, ভূমিহীনরা ভূমি পাওয়ায় তারা পরের দুই দশক সেচের জল, উন্নতমানের বীজ, সার, প্রযুক্তি বা উন্নত যন্ত্র ইত্যাদি চাইবে না। সরকারের খরচ কমবে। দুই, প্রথম প্রজন্মের মালিক হওয়া চাষি এই দাবি করবে না যে কেন্দ্র তাঁদের ফসল পঞ্জাবের মতো কিনে নিক। তিন, সোভিয়েতকে খুশি করা। চার, একটা বড়ো ভোটব্যাংক নির্মাণ। পাঁচ, মুসলমানদের মধ্যে যারা পাকিস্তানে জায়গা পায়নি, তাঁদের হাতে জমি তুলে দিয়ে তাদের ভোট পাওয়া। পশ্চিমবঙ্গে পরের চার দশকের এই রাজনীতির ফসল এখানকার ক্ষমতাশীল দল সম্পূর্ণ তুলতে সফল হয়েছে তা সবাই জানেন।

এবার আসি পঞ্জাবে। পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবের পরের কয়েক বছর মানুষের হাতে অনেক অর্থ আসে। কীভাবে? এক, সেচ প্রকল্পের ঠিকাদারি থেকে। দুই, সেচ প্রকল্পের যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবসা থেকে। তিন, সার ব্যবসা থেকে। চার, বীজের ব্যবসা ইত্যাদি থেকে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো লাভ হলো, এই নীতির ফলে চাষ ওখানে একটা সরকারি চাকরির রূপ নেয়। এখানে চাষিরা কোনো ঝুঁকি নেয় না। ফলন কম হলেও লোকসানের ভয় নেই বা বেশি হলে দাম কম হবার ভয়ও নেই। বাজারের ওঠানামা বা চাহিদা-জোগান থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এক দশকে তাঁদের হাতে অনেক টাকা আসে। তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ে। বহু পঞ্জাবি তাঁদের জমি চাষ করাতে বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রমিক এনে, নিজেদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কানাডা বা আমেরিকায় পাঠানো শুরু করে। যদিও এরপরে কিছু রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়, কিন্তু আজও পঞ্জাবের চাষিরা বেশ পয়সাওয়ালা এবং তার প্রমাণ তিনবছর আগে হওয়া কৃষি আন্দোলন। পঞ্জাবের চাষিরা সেখানে বিএমডব্লুউ বা মার্সিডিস বেঞ্চ নিয়ে আসেন, দামি ট্র্যাক্টর, বাতানুকূল তাঁবু নিয়ে আসেন। এই কথা আমাদের চাষিরা ভাবতেই পারে না। অন্যদিকে ভুল কৃষিঅর্থনীতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থাকেই পঙ্গু করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগের চেয়ে সম্পত্তি বণ্টনকে বেশি গুরুত্ব দেয়। শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, আমাদের শিক্ষাজগৎ এর মূল পৃষ্ঠপোষক। এই মানসিকতা বুঝে, কেন্দ্রও অন্য নীতি গ্রহণ করে আমাদের রাজ্যে। তাছাড়া যখন সবুজ বিপ্লব পঞ্জাবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এখানে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৯৭০ নাগাদ ভারত সরকার বুঝতে পারে যে দেশকে খাওয়ানোর জন্য পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ফসল যথেষ্ট। ১৯৭২-৭৩ নাগাদ যখন স্থিতাবস্থা আসে, তখন সবুজ বিপ্লবের লাভ চলে যায়। তাই এখানে শুরু হয় ভূমি সংস্কার, তড়িঘড়ি গ্রামের মানুষের আক্রোশ কমাতে। আর এখানেই সর্বনাশ। জমির পরিমাণ ছোটো হয়ে যাওয়ায়, ন্যূনতম প্রযুক্তি ও যন্ত্রে বিনিয়োগ চাষির কাছে পুরো ব্যাপারটাকে একটা অলাভজনক করে তোলে। কয়েকবছর পর রাজনৈতিক পরিবর্তন হলে ভূমি সংস্কারের হার আরও বাড়ে এবং সেচ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বিপুল ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়। সবুজ বিপ্লবের দশ বছর আগে যে রাজ্যে ডিভিসি, ময়ূরাক্ষী শেষ হয় এবং কিছুটা এগিয়ে থাকে কংসাবতী, সেই রাজ্যে বন্ধ করে দেয় তিস্তা, সিদ্ধেশ্বরী-নুনবিল, দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী, সুবর্ণরেখা, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। ভাগীরথীর পূর্বতীরে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই ২৪ পরগনায় তো কোনো সেচ প্রকল্প আজও ভাবা হয়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, কেন্দ্রীয় সরকারকে ফসল কেনার ব্যাপারে যে শর্ত স্বামীনাথন কমিটি দেয়, সেই শর্ত পূরণের পরিকাঠামো গত ৫২ বছরে কোনো রাজ্য সরকার করেনি। তাই পঞ্জাব এবং হরিয়ানার ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ফসল যেখানে সরকার নির্ধারিত দামে কেন্দ্র কিনে নেয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ১০ শতাংশ ফসল কেনে। ফলে, ব্যর্থ হয় আমাদের রাজ্যের কৃষি। মানুষ আরও দরিদ্র হয় এবং হাজার হাজার চাষি রাজ্য ছেড়ে চলে যায় ভিন রাজ্যে।

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

কিন্তু যে জমি তারা পেল তার কী হলো?

ছোটো জমি, সরকার থেকে ভরতুকি না পাওয়া, সেচ ও হিমঘর পরিকাঠামোর অভাব এবং রাজনৈতিক অত্যাচার কৃষিকে যখন অলাভজনক ক্ষেত্রে পরিণত করে, তখন জমির মালিকরা কম দামে সেই জমি চুক্তি চাষের জন্য দিয়ে দেয় রাজনৈতিক বাহুবলীদের, যারা অনেক জমিকে এক করে শুরু করে চুক্তি চাষ। পরে সেই জমির চরিত্র বদল করে শুরু হয় মৎস্যচাষ। এখানে বিনিয়োগ শুরু করে অসৎ নেতা ও বাবুরা। ধীরে ধীরে আইনকানুন না মেনে এই মৎস্যচাষ ব্যবসা থেকে শুরু হয় চিংড়ি চাষের, যার মূল লক্ষ্য কালো টাকাকে সাদা করা। আর এই পুরো প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজকে শেষ করে দেয়। লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ ক্ষেতের জমি ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

এক দেশ। দুই রাজ্য। দুই রাজ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজকে বেগ দিয়েছে। দুই রাজ্যই দেশভাগের ফল ভুগেছে। কিন্তু একটি সঠিক অর্থনৈতিক পথ অবলম্বন করে কৃষি কাজের মাধ্যমেই ধনী হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের কানাডা-আমেরিকা পাঠিয়েছে। বড়ো বড়ো ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। দ্বিতীয়টি ভুল আবেগে, ভুল অর্থব্যবস্থা অবলম্বন শুধু করেনি, নিজের রাজ্যকে এক ভুল অর্থনীতির পরীক্ষাগারের গিনিপিগ বানিয়ে তাকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিয়েছে। আজ তারা পরিযায়ী শ্রমিক। □

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে অরুন্ধতী রায়ের ডাহা মিথ্যাকে আউড়ে যাচ্ছে বাম-লিবারেল দেশদ্রোহীরা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তৃতার জন্য বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের ৪৫ (১) ধারায় অরুন্ধতী রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দেওয়ার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি.কে. সাক্সেনার সিদ্ধান্তকে মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, এতে ১৪ বছর সময় লেগে গেছে। অরুন্ধতী এবং তার দলবল শুধুমাত্র জাতি হিসেবে ভারতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, উপরন্তু অসত্য ও অর্ধ-সত্যের উপর ভিত্তি করে গল্প বানিয়ে বিভেদ বাড়ায়, অসন্তোষে ইন্ধন জোগায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার, ২০০২ সালের গুজরাটে গোধরাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গার সময় বাম-ফ্যাসিস্ট গ্যাং ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ২০০২ সালের ৬ মে আউটলুক পত্রিকায় ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ (আনুমানিক ৬০০০ শব্দ) প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'গণতন্ত্র : তিনি বাড়িতে থাকলে কে?' গুজরাটের সহিংসতা নিয়ে অরুন্ধতী রায় লিখেছিলেন : 'গত রাতে বরোদার এক বন্ধু সাঈদা জনতার হাতে ধরা পড়েছিল। শুধুমাত্র তার পেট চিরে ফেলা হয়েছিল এবং জ্বলন্ত ন্যাকড়া গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র তার মৃত্যুর পরে, কেউ তার কপালে 'ওম' খোদাই করেছিল।'

অরুন্ধতীর এই ঘৃণ্য 'ঘটনা' দেখে হতবাক হয়ে তৎকালীন বিজেপি রাজ্যসভা সাংসদ বলবীর পুঞ্জ গুজরাট সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। পুলিশ তদন্তে জানা গেছে যে সাঈদা নামে কারও সঙ্গে এমন কোনও মামলা শহর বা গ্রামীণ বরোদায় রিপোর্ট করা হয়নি। পরবর্তীকালে, পুলিশ নির্যাতিতাকে শনাক্ত করতে এবং এই অপরাধে দোষী ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে যেতে পারে এমন সাক্ষীদের কাছে যাওয়ার জন্য শ্রীমতী রায়ের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কোনো সহযোগিতা পায়নি। উলটে অরুন্ধতী রায় তাঁর আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন যে পুলিশের সমন জারি করার ক্ষমতাই নেই। এই ভাবে তিনি টেকনিক্যাল অজুহাতের আড়ালে নিজের মিথ্যাকে লুকিয়েছিলেন। বলবীর পুঞ্জ ২০০২ সালের ৮ জুলাই, আউটলুকে 'ডিসিম্যুলেশন ইন ওয়ার্ড অ্যান্ড ইমেজেস' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তার জবাবে এই ঘটনাটি তুলে ধরেন।

অরুন্ধতী রায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'জনতা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, মুখ্য সচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র)-এর কাছে তার করা ফোন কলগুলোর সাড়া মেলেনি। তার বাড়ির আশপাশে টহলদার পুলিশ ভ্যানগুলোও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। জনতা ঘর ভেঙে ঢুকে পড়ে। তারা তার মেয়েদের নগ্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর তারা এহসান জাফরির শিরশ্ছেদ করে তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। অবশ্যই, এটি শুধু কাকতালীয় যে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজকোট বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারের সময় জাফরি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কঠোর সমালোচক ছিলেন...।'

জাফরি দাঙ্গায় নিহত হন কিন্তু তার কন্যাদের 'নগ্ন' বা 'জীবন্ত পুড়িয়ে' দেওয়া হয়নি। আবার ডাহা মিথ্যা! তাঁর পুত্র টিএ জাফরি 'নোবডি নিউ মাই ফাদার্স হাউস ওয়াজ দ্য টার্গেট' শীর্ষক প্রথম পৃষ্ঠায় এক সাক্ষাৎকারে (এশিয়ান এজ, ২ মে, ২০০২, দিল্লি সংস্করণ), বলেছিলেন, 'আমার ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই একমাত্র ভারতের বাসিন্দা এবং আমি পরিবারের সবচেয়ে বড়ো। আমার বোন ও ভাই যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। আমার ৪০ বছর বয়স এবং আমি আহমেদাবাদে জন্মেছি ও বড়ো হয়েছি।' বলবীর পুঞ্জ তার 'ফিডলিং ইউথ ফ্যাক্টস অ্যাজ গুজরাট বার্নস' নিবন্ধে ২৭ মে, ২০০২-এ অরুন্ধতীর বানোয়াট কথাগুলোকে খণ্ডন করেছিলেন, যা নিশ্চিত করে যে জাফরির মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপদ ছিল, যেমনটি তার ছেলে জানিয়েছিল।

বলবীর পুঞ্জের প্রবন্ধ প্রকাশের পর, অরুন্ধতী রায় আউটলুকে একটি ছদ্ম ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। 'জাফরি পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইছি' শিরোনামে সেই জাল ক্ষমাপ্রার্থী বলেছেন : 'আমার প্রবন্ধে 'গণতন্ত্র : তিনি বাড়িতে থাকলে কে?' (৬ মে) এক বাস্তব ত্রুটি রয়েছে। এহসান

জাফরির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি বলেছি, বাবার সঙ্গে তার মেয়েরাও নিহত হয়েছে। পরবর্তীকালে আমাকে জানানো হয়েছে যে এটা সঠিক নয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা বলছে, এহসান জাফরি তার তিন ভাই ও দুই ভাগ্নে-সহ নিহত হয়েছেন। সেদিন চমনপুরায় যে ১০ জন নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল— টাইম ম্যাগাজিন (১১ মার্চ) মীনাক্ষী গাঙ্গুলী এবং অ্যান্থনি স্পেথের একটি নিবন্ধ এবং একটি স্বাধীন সত্য-অনুসন্ধানী মিশনের ‘গুজরাট কার্নেজ ২০০২ : এ রিপোর্ট টু দ্য নেশন’ রিপোর্ট। এই মিশনে আছেন প্রাক্তন আইজিপি ত্রিপুরা, কে এস সুব্রহ্মণ্যম এবং প্রাক্তন অর্থসচিব এসপি শুক্লা। আমি মি: সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে এই ত্রুটির বিষয়ে কথা বলেছি। তিনি জানান, ওই সময় পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে তার তথ্য এসেছিল।’ (ওই কর্মকর্তার নাম কী? সুব্রহ্মণ্যম, অরুন্ধতী রায় কেউই তা বলেননি!)

এই ক্ষমা প্রার্থনাটাও মিথ্যা। কারণ সেই জাল ক্ষমা প্রার্থনায় অরুন্ধতী রায় দাবি করেছেন যে সেদিন ১০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল। বাস্তবে, ২০০২ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে তৎকালীন ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ার পরে, কেউ কোনও ধর্ষণের উল্লেখ খুঁজে পায়নি। টাইম ম্যাগাজিনের ১১ মার্চ ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের মিথ্যা গল্প নকল করে, ২০০২ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে ধর্ষণের এই গল্পগুলি বাজারে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। অরুন্ধতী রায় বা টাইমসের প্রতিবেদক কেউই এই মামলায় ধর্ষণের প্রমাণ দিতে পারেননি। অরুন্ধতী রায়ও শুধু জাফরি পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তিনি যে বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদীকে চরম ঘৃণ্য অপবাদ দিয়ে তাদের মানহানি করেছেন তার জন্য কোনো ক্ষমা চাননি। তার গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল।

লক্ষ্য করুন, কীভাবে ক্ষমা চাওয়ার সময়, অরুন্ধতী রায় নিশ্চিত করেন যে সেটা শুধুমাত্র ‘জাফরি পরিবারের কাছে’ করা হয়েছে। কিন্তু সেই নিবন্ধে অরুন্ধতী রায়ের আরও বেশি মিথ্যা কথা ছিল যার জন্য তাকে ১৫৩এ, ৪৯৯-৫০০ (মানহানি) এবং সেইসঙ্গে জাল খবর/মিথ্যা নিয়ে চর্চা করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় বিচার করা উচিত ছিল। তিনি লিখেছেন, ‘তার (জাফরির) ফোন কল পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার (অর্থাৎ পিসি পাণ্ডে), প্রধান সচিব, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র) উপেক্ষা করেছিলেন। তার বাড়ির চারপাশে মোবাইল পুলিশ ভ্যানগুলি হস্তক্ষেপ করেনি।’

পুলিশ কমিশনার, মুখ্যসচিবকে ফোন করার এইসব দাবি মিথ্যা। সিট পুলিশ কমিশনার পাণ্ডের কল রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখেছে যে জাফরি (সিটের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ২০৩-০৪ পৃষ্ঠায়) কোনো কল করেননি, যদিও পাণ্ডে সেই দিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে ৩০২টি কল করেছিলেন/গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই দিন, মুখ্যসচিব জি সুব্বারাও বিদেশে ছিলেন, ছুটিতে ভারতের বাইরে। সিট রিপোর্টে ৩১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, তাহলে জাফরি কীভাবে তাকে ফোন করতে পারেন? সিট-এর মতে, পুরো আবাসিক কমপ্লেক্সে জাফরির ল্যান্ডলাইনই একমাত্র চালু ফোন ছিল।

অরুন্ধতীর অভিযোগ, জাফরির বাড়িতে জনতার ভিড় থামাতে পুলিশ কিছুই করেনি। বাস্তবে, তার বাড়ির বাইরে পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছিল এবং সিটের চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুসারে (পৃষ্ঠা ১) তারা তার বাড়ির বাইরে চারজন হিন্দুকে গুলি করে হত্যা করে, ১১ জনকে আহত করে, জনতাকে লাঠিচার্জ করে, ১২৪ রাউন্ড গুলি করে এবং ঘটনাস্থলে ১৩৪টি টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটিয়ে দেয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ টাইমস অব ইন্ডিয়াও অনলাইনে রিপোর্ট করে যে, পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেড দাঙ্গাকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে এবং কোথাও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করা হয়নি। পুলিশের পক্ষে প্রায় ২০ হাজারের বেশি লোকের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব ছিল এবং জাফরি ভিড়ের উপর তার রিভলবার থেকে গুলি চালানোর পরে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যাতে ১৫ জন হিন্দু আহত হয় এবং ১ জন হিন্দু মারা যায়, এসআইটি রিপোর্ট (১ পৃষ্ঠা) অনুসারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পর্বে পুলিশ ১৮০ জন মুসলমানকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বড়ো ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়েছে। এবং কোথাও টাইমস অব ইন্ডিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু করেনি বলে অভিযোগ করেনি।

১৮ মার্চ ২০০২-এ ইন্ডিয়া টুডে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে জাফরির বাড়ির বাইরে অন্তত ৫ জন দাঙ্গাবাজকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। সিট রিপোর্টে পৃষ্ঠা ১-এ আরও বলা হয়েছে যে পুলিশ প্রায় ১৮০ জন মুসলমানের জীবনও বাঁচিয়েছিল, যেহেতু বাড়ির ভিতরে থাকা ২৫০ জনের মধ্যে ৬৮ জন মারা গিয়েছিল (সবাইকে নিখোঁজ হওয়ার পরে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল)।

এসআইটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন (১৬ পৃষ্ঠায়) বলে যে, ‘স্থানীয় পুলিশের সামনে তার বিবৃতিতে (৬ মার্চ ২০০২ সিআরপিসির ১৬২ ধারায় রেকর্ড করা হয়েছে) তিনি (অর্থাৎ জাকিয়া জাফরি, এহসান জাফরি বিধবা) বলেছিলেন যে জেল ভ্যানে গুলবর্গা সোসাইটি থেকে তাদের স্থানান্তরিত করার সময় সেখানে জড়ো হওয়া জনতা তাদের সবাইকে পিটিয়ে মেরে ফেলত কিন্তু পুলিশের সময়মতো পদক্ষেপের জন্য পারেনি।’

এটা অরুদ্ধতী রায়ের বিরোধীদের, বিজেপি-সহ দোষ হয়েছিল যে তারা এই ধরনের মিথ্যার বিরুদ্ধে মামলা করেনি। এই ধরনের ট্র্যাশ প্রকাশ করার জন্য আউটলুকের বিরুদ্ধেও মামলা করা উচিত ছিল, কারণ এসবই ছিল আইনের স্পষ্ট গুরুতর লঙ্ঘন। তাদের প্রয়াত অরুণ জেটলির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, যিনি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে আপ নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করেছিলেন যখন তারা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন এবং তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছিলেন। □

প্রদীপের নীচে অন্ধকার

অজয় ভট্টাচার্য

সম্প্রতি নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসকে কেন্দ্র করে চারদিকে এমন একটি বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে যেন পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ড, আর নিটের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা পরস্পর সদৃশ। যা আসলে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের অপরাধকে লঘু করে দেখাবার একটি হীন প্রয়াস। দুটি বিষয়ের মধ্যে তফাতকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ড ঘটেছে শাসক দল ও সরকারের একটি অংশের প্রত্যক্ষ মদতে। যেখানে একাধিক আমলা, মন্ত্রী ও শাসক দলের ছোটো-বড়ো একাধিক নেতা জড়িয়ে ছিলেন। হাতেনাতে ধরাও পড়েছেন। টাকার পাহাড় ‘অপার’ বেডরুম ছাপিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল। টিভির পর্দায় মূল্যবান গহনা ও টাকার বান্ডিলের সজ্জার বহর দেখে শিউরে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের সচেতন নাগরিক সমাজ। এখনও অপরাধীদের জীবন কাটছে শ্রীঘরের চার দেওয়ালের কালো অন্ধকারে। অপরপক্ষে নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে স্থানীয় ভাবে দু’ একটি অসাধু চক্রের মাধ্যমে। যার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বা দলের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই বলেই সরকার উপযাচক হয়ে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে প্রশ্ন ফাঁস ঘটনা রুখতে কড়া আইন প্রণয়ন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বচ্ছতার সাপেক্ষে এর চাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? উলটোদিকে শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতি প্রতিরোধে রাজ্য সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কখনো। ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তদন্তভার সিবিআই বা সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেনি কখনো। উলটে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে শেষ পর্যন্ত। দেখেও না দেখার ভান করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে শাসক দল। দলের একাংশ যে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, একথা শাসক দলের নেত্রীর অজানা নয়। তাই মাঝে মাঝে সে কথা স্বীকারও করেও নেন প্রকাশ্যে। যদিও দুর্নীতির অভিযোগ মেনে নেওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি কখনো। তাই সন্দেহ জাগে এই স্বীকারোক্তি কী দলকে সংশোধন করার অভিপ্রায়ে, না জনমানসে নিজের স্বচ্ছ ভাবমুর্তি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে! আবার এমনও হতে পারে দলের যে অংশ দুর্নীতিকে পছন্দ করে না, তাদের শান্ত করার জন্য তাঁর এই হম্বিতম্বি।

একটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনায় আসা যাক। শিক্ষার আলোয় এনেও কেন শিক্ষার্থীদের মন থেকে অসাধু উপায় অবলম্বনের প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না? পরীক্ষার হলে টোকাটুকির প্রবণতা দিয়ে শুরু হয় অসাধু উপায়ে হাত পাকানোর কাজ। এর অভিঘাত পড়ে শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে। পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের প্রয়োজন হয় অসাধু বৃত্তিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিদর্শকদের চোর-পুলিশ খেলা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। নতুন কিছু নয়। তাই প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক যে, প্রচলিত শ্রেণী-শিক্ষণ কি এই প্রবৃত্তিকে রুখে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়? পাঠ্যবিষয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা কি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়?

অপরাধপ্রবণতা জীবের সহজাত প্রবৃত্তি, যাকে অবদমিত করে রাখতে পারে শিক্ষা। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা কখোনোই সেই প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলতে পারছে না। ইতরশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না। তাই তাদের মধ্যে যে কোনো অর্থাৎ প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। যদিও প্রশিক্ষণের সাহায্যে কোনো কোনো ইতর প্রাণীকে কিছুটা শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও ন্যায়-নীতি বোধ চুলোয় দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ কেন এত অপরাধপ্রবণ? বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেন ক্রমশ অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করে চলতে চলতে অন্যায়টাকে ন্যায়ের জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। দেখে শুনে মনে হয়, অপরাধপ্রবণতাকে অবদমিত করে রাখতে প্রচলিত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। ইনভিজিলেটরকে এড়িয়ে পরীক্ষায় টোকাটুকি করার নিপুণতা সহপাঠীদের চোখে বীরের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বইমেলা থেকে বইচুরির ঘটনা রীতিমতো গর্ব করে বলার মতো হয়। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং বাড়ে। শিক্ষকতার মতো মহান ব্রতে যাঁরা নিযুক্ত হতে চান, তাঁদের একাংশের লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে ঘুরপথে চাকরি পেতেও বাধে না। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে যাঁরা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করেন তাঁরা কেউ স্বল্প শিক্ষিত নন। প্রায় সকলেই ডিগ্রিধারী। তাই বলা যায়, অপরাধীদের অপরাধপ্রবণতা শিক্ষার আলোয় যেন আরও ধারালো হয়ে উঠছে। প্রদীপের নীচে অন্ধকার। তাই এই জৈবিক প্রবৃত্তিটি হয়তো কোনোভাবেই নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে দমিয়ে রাখা সম্ভব— সৎসঙ্গে, সৎচিন্তায়, সৎশিক্ষায়। যেমন সবকিছুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এমন বিশ্বাসী হতে পারলে ইন্দ্রিয়ের চাহিদাকে নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভালো চিন্তায়, ভালো কাজে নিজেকে সমর্পণ করা যায়।

এবার আসছি একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধানে। সহজে কার্যসিদ্ধি করার বাসনা থেকে মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর খবরদারি করতে শিখেছে। নিজের খেয়ালখুশি মতো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রকৃতিকে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে। সকল ঝঞ্ঝাটের কারণ সেটাই। মানুষ যন্ত্রের ব্যবহারের ওপর লাগাম না টেনে উলটে তার ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে। সর্বত্র তাঁর শাসকের আসন চাই। অথচ শাসক হওয়ার যোগ্যতা যে সকলের থাকে না, সেই সত্য সে মেনে নিতে পারে না। তাই প্রতিযোগিতায় না পারলে ঘুরপথে সফল হওয়ার রাস্তা খুঁজে নেয়। সেখানে মূল্যবোধ নিয়ে ভাবার অবকাশ তার নেই। যার ফলে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। এক কথায় ‘প্রশ্নের’ চাহিদা আছে, তাই ফাঁস হওয়ার ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। একমাত্র কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছাড়া এ থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। সঙ্গত কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর আইন আনতে বাধ্য হয়েছে। □

বিশেষ নিবন্ধ

ওড়িশায় প্রথম বিজেপি সরকারের সৌজন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

আনন্দ মোহন দাস

কয়েকদিন আগে ওড়িশায়, স্বাধীনতার পর প্রথম বিজেপি মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা তফশিলি উপজাতির প্রতিনিধি মোহন মাঝি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেডি দলের প্রধান নবীন পট্টনায়ককে নবীন মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নবীনবাবু সমস্ত বৈরিতা দূরে ঠেলে খোলা মনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যে সৌজন্য প্রদর্শন করলেন তা বিরল না হলেও অভূতপূর্ব। শাসকদল বিজেপির পক্ষ থেকেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা-সহ এক গুচ্ছ বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাঁকে স্বাগত জানালেন তা বর্তমান পঙ্কিল রাজনীতিতে এক উদাহরণস্বরূপ। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, ‘বড়ো কাজের জন্য বড়ো মন চাই।’

বলাবাহুল্য অন্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো এবং সাদরে অভ্যর্থনা করা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। এটি ভারতীয় সংস্কৃতির ‘অতিথি দেবো ভবঃ’ এই মূল সুরটির প্রতিফলন। রাজনীতির আঙিনায় প্রতিপক্ষ মানে যে শত্রু নয় তা উভয় দলই প্রমাণ করে দেখিয়েছে। সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপিত হলো। এ যেন ভদ্রতায়, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গকে কষিয়ে থাপ্পড় মারার শামিল। এই ঘটনা অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকে ভূলুণ্ঠিত করে বঙ্গবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও সৌজন্য ও পারস্পরিক সহযোগিতাই সুস্থ গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজ্যের উন্নয়নে উভয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অভিযোগ রয়েছে, সৌজন্য দূরে থাক, জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী এমএলএ, এমপিদেরও ডাকা হয় না। বিরোধীদের এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে শাসকদলের অনীহা ও নিরন্তর বাধা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের শত্রু ভাবা হয়। কিন্তু ওড়িশায় নতুন সরকারে ভিন্ন চিত্র দেখা গেল। তাই এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি বিরোধী দলগুলির চক্ষু উন্মীলিত করেছে। গণতন্ত্রে অন্যতম শর্ত হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ২৫ বছরের ক্ষমতার অবসানে বিজয়ী দলের পক্ষ থেকে কোনো হিংসা, অত্যাচার, বদলা ও রক্তপাত নেই। তাদের রাজ্যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে নতুন সরকার দেশের সামনে তুলে ধরে রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নবীনবাবু কেন্দ্র ও রাজ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অগ্রণী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বন্ধ্যাত্বকরণ হয়েছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পিছনের সারিতে। রাজ্যের হিংসাত্মক পরিবেশে এবং শিল্প উপযোগী সুবিধার অভাবে কোনো শিল্পপতি এখানে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। প্রচারের ঘনঘটায় অনেক মৌ স্বাক্ষর হলেও শিল্পের শ্মশান যাত্রা ঘটেছে। বাঙ্গালির গর্ব করার মতো আজ আর কিছু নেই। দুর্নীতি এ রাজ্যে আজ শিল্পে পরিণত হয়েছে।

বাঙ্গালি আজ সর্বভারতীয় স্তরে চোর বদনামে ভূষিত হয়েছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও হিংসার পরিবেশ রাজ্যকে কলুষিত করেছে। সারা ভারতে নির্বাচনী হিংসা যখন উধাও হয়েছে, তখন তা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হয়েছে। রাজ্যের আনাচে কানাচে প্রতিনিয়ত গুলি-বোমার আওয়াজে আকাশ বাতাস দূষিত হয়েছে। বহু মায়ের কোল খালি করে শাসকদল নির্বাচনী জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে। রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করছে। যে বাঙ্গালি সুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে বড়াই করতো, আজ তারা অপসংস্কৃতির বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করেছে। নিজের রাজ্যে অসহায় বাঙ্গালি জীবিকার সন্ধানে আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। পেটের দায়ে অসংখ্য বাঙ্গালি পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন্ন রাজ্যে আস্তানা গেড়েছে। বুনিয়াদি উন্নয়নকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাটমানি ও ভাতায় খুশি থেকেছে।

তাই পাশের রাজ্য ওড়িশা প্রমাণ করেছে তারা ভাতায় বিশ্বাসী নয়, বরং কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও শিল্পে বিশ্বাসী। তাই ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সর্বদা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এখানে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার পথটি বন্ধ করে জিএসটি আর মদের আয়ের উপর নির্ভর করেছে। তাছাড়া শাসকদল রাজ্যের ঋণের বোঝা বাড়িয়ে ভোট কিনতে ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে, স্বাবলম্বী হবার জন্য নয়। সেক্ষেত্রে ওড়িশা কেন্দ্রের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে রাজ্যের উন্নয়নে অর্থ আদায়ে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থে তারা ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার ও জিএসটি চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করে দায়িত্বশীল প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থেকেছে। সুষ্ঠু গণতন্ত্রে রাজ্যের উন্নয়নে এটাই কাম্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৪৫ বছর কেন্দ্র বিরোধী সরকার থাকায় রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা তখন কেন্দ্র বিরোধী হয়ে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢেকেছি। বিধান রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় সমস্ত সরকার কেন্দ্র বিরোধী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করেছে।

তাই বাঙ্গালির এখন আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। অন্যথায় দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া বাঙ্গালির সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। বাঙ্গালিকে আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও রক্তপাতের পিছনে ছুটবে, না শান্তিপূর্ণ রাজ্য গড়ার জন্য শপথ নেবে। দুর্নীতি, কাটমানি ও সিন্ডিকেটের পিছনে ছুটবে, না সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে বাঙ্গালির মুখে হাসি ফোটাবে। এটাই এখন বাঙ্গালির সামনে বড়ো প্রশ্ন। □

কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি?

১. হায়দরাবাদকে যদি ১৫ মিনিটে পুলিশ প্রশাসন মুক্ত করা হয় তবে ওইটুকু সময়েই সমস্ত হিন্দুদের নিকেশ করা যাবে। বক্তা, আসাদউদ্দিন ওবেসির ভাই। ২. বহরমপুরে ৩০ শতাংশ হিন্দুকে শেষ করে ভাগীরথীতে ভাসাতে আমার আধঘণ্টাই যথেষ্ট। বক্তা, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। ৩. কার্তিক মহারাজ, ওটাকে আমি সন্ন্যাসী বলে মনে করি না। বক্তা, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। ভাবুন, আমরা কোন দেশে বাস করছি? মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর পরই মুর্শিদাবাদে রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলা এবং শিলিগুড়ি সেবক রোডের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের সময় থেকে এই হিন্দু বিরোধী মন্তব্যগুলো আমরা শুনে আসছি। অথচ সেকুলার মুখোশধারী বাম, কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটের বিরোধীরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চুপ। নিশ্চুপ পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও। প্রতিবাদে শুধু রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন। এই রাজ্যের সাধারণ মানুষও পথে প্রতিবাদে খুব একটা নামেনি। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শুধুমাত্র দুধেল গাইদের তুষ্ট করে ভোটবাক্স ভরাবার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল এই নীতিতে বিশ্বাসী। হিন্দুর হয়ে প্রতিবাদ করলেই হিন্দুদের গোঁড়া, ধর্মান্ধ, ইসলামবিরোধী তকমা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ মুসলমান তোষণ করলেই সেকুলার। আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধরনের পরিস্থিতি হিন্দুর পক্ষে একেবারেই সুখকর নয়। কেননা ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু সমাজ আজও ঐক্যবদ্ধ নয়। তার প্রমাণ বর্তমান লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। এখনো সময় আছে, হিন্দু সমাজ জাগ্রত, সংগঠিত না হলে হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—**ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়,**
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদে বিজেপির জয় সম্ভব

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মোট প্রাপ্ত ভোট খুবই ভালো। আসন সংখ্যা কমলেও হতাশার কিছু নেই। নেতৃত্ব নিশ্চয়ই এর মূল্যায়ন করে আগামীদিনে আরও ভালো ফল করবে।

জয় পরাজয়ের সূত্র রামায়ণ ও মহাভারতেই লুকিয়ে আছে।

১. শ্রীরামচন্দ্র রাজা হবার আগে বনবাসে গিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে তবেই জয়লাভ করেছেন। আমাদেরও ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম করতে হবে। অত্যাচারের কাছে মাথা নত করলে হবে না।

২. রামরাজ্য সুশাসনের প্রতীক। বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তা, সাংসদ ও বিধায়কদের নিয়মিত ভাবে নিজের এলাকায় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো কীভাবে পাওয়া যায় তা মানুষকে বোঝাতে হবে। কিষাণ সম্মান নিধি, বিশ্বকর্মা যোজনা, ৭০-এর ঊর্ধ্বে বয়স্কদের জন্য নতুন চালু হওয়া আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, সূর্যঘর, আবাস যোজনা ইত্যাদির ফর্ম বিলি করা, রেজিস্ট্রেশন করতে সাহায্য করা এবং না পাওয়াদের জন্য জন-আন্দোলন করতে হবে।

৩. শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের নির্দেশ দিয়েছেন। রামচন্দ্র এক অসম্ভব সেতু নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোবর্ধন পর্বত আঙুলে করে তুলে প্রজাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশ এগিয়ে চলেছে। রামনবমীতে শুধু শোভাযাত্রার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষরোপণ, শিশুদের গল্পের বই, পেনসিল বিতরণ, গরিব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ--- এসব করলে শ্রীরামের আশীর্বাদ লাভ হবে। প্রধানমন্ত্রী জনঔষধী কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

মোদী সরকার যেসব প্রকল্প ভারতবাসীকে দিয়েছে তার সুবিধা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও পেয়েছেন। তাই তাদের তোষামোদ না করে অন্যভাবে তাদের কিছু ভোট অবশ্যই বিজেপির ঝুলিতে আনতে হবে।

মানব কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিছু স্ট্র্যাটেজি আমাদের শিখিয়েছেন। দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, কর্ণের বধ এর উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের ভালোর জন্য কিছু কার্যকর স্ট্র্যাটেজির কথা আমাদের ভাবতে হবে।

রাম নাম বৃথা যাবে না। বিজেপির হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চয়ই সুশাসন ফিরবে।

—**ডাঃ সমরজিৎ ঘটক,**
দুর্গাপুর, প: বর্ধমান।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আগুন পুস্তক জ্বালিয়ে ছাই করতে পারে কিন্তু বিদ্যাকে নয়, জ্ঞানকে নয়। তাই আজ আবার ভারতের বুকে ইতিহাস নির্মাণ হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যে সময় গোটা বিশ্ব শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল সেই সময় ভারতে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৃহদায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন করে গোটা বিশ্বকে শিক্ষার আলো দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রথম কুমার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ হওয়া ভারত তথা বিশ্বের বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নালন্দায় ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন, কোরিয়া, মধ্য এশিয়ার পণ্ডিত এবং ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসতেন। যেখানে ছিল প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ছাত্র এবং ২০০০ আচার্য। বিরল শাস্ত্র ও হাজার হাজার পুস্তক নিয়ে নয় তলা উঁচু বিশাল আকার গ্রন্থাগার। সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র,

ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধসাহিত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, শরীরতত্ত্ববিদ্যা, সংগীত, চিত্রকলা-সহ আরও নানান বিষয় পড়ানো হতো। বারোশো খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বখতিয়ার খলজি নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করে। পুড়িয়ে দেয় গ্রন্থ ভাণ্ডার, সেখানে এত গ্রন্থ ছিল যে কয়েক মাস সময় লেগেছিল গ্রন্থগুলি পুড়তে।

আজ প্রায় ৮০০ বছর পর গত ১৯ জুন নালন্দা পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে ভারত নজির সৃষ্টি করছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে শুধু ভারতের পুনর্জাগরণ তা নয়, সমগ্র এশিয়া-সহ গোটা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার জাগরণ। এই ব্যবস্থাকে পুনর্জাগরণের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে, ১৭টি দেশ অংশগ্রহণ করে— অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনাই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মরিশাস, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড, পর্তুগাল, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসব দেশের রাষ্ট্রদূতরা নালন্দায় আসেন। যা বসুধৈব কুটুম্বকমের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। রাজগীরের আধুনিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (এনইউ) নালন্দার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হলো ঐতিহাসিক নালন্দার প্রাচীন গৌরবকে বৌদ্ধিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করা। NU প্রতিষ্ঠার জন্য 2nd East Asia Summit (EAS) (Philippines, 2007) এবং 4th East Asia Summit (থাইল্যান্ড, ২০০৯) এ প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিকাশের প্রতীক তৈরি হয়েছে।

২০৪৭-এর মধ্যে ভারত গোটা বিশ্ব দরবারে শিক্ষার কেন্দ্র তৈরি হবে, এই লক্ষ্যের আর এক পদক্ষেপ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। যা গোটা বিশ্বের ছাত্রকে ভারতের দিকে আকর্ষণ করবে। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হতে আসবে গোটা বিশ্ব। যে ভারত গোটা বিশ্বকে গণিতের সংখ্যা থেকে সর্বোচ্চ সূত্র প্রদান করেছে এবং নানান বিষয়ে গভীরতার সহিত অধ্যায়নের মাধ্যমে বিশ্বকে নানা জ্ঞান প্রদান করেছে সেই শিক্ষানীতি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। শিক্ষার পুনর্জাগরণ দেখে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে, যা এক সময় গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত করবে।

—**মৌসম রায়,**
আঁকুটি, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি।

বিনা অপরাধে সাজা কেন ?

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ৬ মে, ২০২৪, সুবল সরদার মহাশয়ের 'জাস্টিস দেবাংশু বসাকের রায় সঠিক ও সময়োচিত' পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই পত্রের অবতারণা। গত ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস দেবাংশু বসাক এবং সাব্বার রসিদির ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬ হাজার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যায়। সুবলবাবু লিখেছেন, এই রায় সঠিক ও সময়োচিত। তিনি আরও লিখেছেন, এই রায়ে ঘুষ দেওয়া শিক্ষক ছাড়া সবাই খুশি। অর্থাৎ উনি খুব নিশ্চিত যে যাদের চাকরি বাতিল হলো তারা সবাই ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। আসল সত্যটা হলো, সুবলবাবু কলকাতা হাইকোর্টের রায় বা সিবিআই রিপোর্ট কোনোটাই ঠিকমতো পড়েননি। তিনি ওগুলো পড়ে থাকলে এই ধরনের অর্বাচীন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন। সিবিআই রিপোর্টের ভিত্তিতে তার রিপোর্ট যেটি কলকাতা হাইকোর্টে জমা করেন, সেখানে পরিষ্কারভাবে ৪টি ক্যাটাগরি মেনশন করা আছে। যে উপায়গুলি অবলম্বন করে একটি অংশ অবৈধ উপায়ে চাকরি পেয়েছে। (১) সাদা খাতা জমা দিয়ে, (২) প্যানেলের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর, (৩) এম প্যানেল বা ওয়েটিং লিস্টে নাম না থাকা, (৪) আর একটি অংশ যারা র‍্যাঙ্কিং জাম্প করে চাকরি পেয়েছে। মাথায় রাখতে হবে, এই সংখ্যাটা এসএসসি-র হিসেবে ৫৩০০-র আশেপাশে হবে। আর বাকিদের বিনা অপরাধে সাজা হলো কেন ? বাকিদের মধ্যে এই পত্রলেখকও আছে। আমার অপরাধ হলো, ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়ে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে বাড়ির কাছে আসা। আমি ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত চাকরি করতাম।

এবার জাস্টিস বসাকের রায়ের প্রসঙ্গে আসি। উনি উল্লিখিত ৪টি কারণ ছাড়া আরও ১৩টি কারণ দেখিয়ে চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছেন। তার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, নায়সা'কে দিয়ে মূল্যায়ন ইত্যাদি। এই মোট ১৭টি কারণের সঙ্গে আমাদের মতো যোগ্যদের কোনো সম্পর্ক নেই। যেগুলি রায়ের ২৬ নং পেজে আছে। বিচারপতি বসাক অযোগ্যদের সুদ সমেত টাকা ফেরত দিতে বলেছেন, যে সংখ্যাটা ৫৩০০ মতো। উনি সিবিআই রিপোর্টের ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছেন। তাহলে বাকিরা স্বাভাবিকভাবেই যোগ্য, এটা প্রমাণিত হয়।

শেষে সুবলবাবু-সহ পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, আমরা যারা ২০১৬ সালের আগে থেকে চাকরিটা করতাম, তাদের একটা অংশ লোয়ার থেকে হায়ার ক্যাটাগরিতে পরীক্ষায় বসার জন্য কোনো আইনি বাধা ছিল না। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সওয়াল আর জাস্টিস বসাকের ২০১৬ সালের একটি রায়ের ফলে আর একটি অংশ যারা একই বেতন কাঠামোতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন শুধুমাত্র বাড়ির কাছে আসার জন্য। সুবলবাবুর উচিত ছিল মন্তব্য করার আগে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

—**বিশ্বজিৎ মণ্ডল,**
ডেবরা,পশ্চিম মেদিনীপুর।

With Best Compliments -

A
Well Wisher

স্বাধ্যায় ও মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

আমরা স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর উদ্‌যাপন করতে চলেছি। এখন আমাদের সামনে রয়েছে স্ব-তন্ত্র স্থাপনের মতো গুরুদায়িত্ব। এর জন্য স্বাধ্যায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ‘স্ব’ অর্থাৎ নিজস্ব ১. এই নিজস্ব অধ্যয়ন হলো স্বাধ্যায়। বিশেষ করে স্বদেশ সম্পর্কিত অধ্যয়ন এই মুহূর্তে আমাদের সকলের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের গৌরবময় সমাজ, দেশ সম্পর্কিত পুস্তকগুলির নিরন্তর অধ্যয়নকে আমরা স্বাধ্যায় বলতে পারি।

বর্তমানে মুঠোফোনের দৌরাত্ম্যে এইরকম একটি সুঅভ্যাসে ভাটা পড়েছে। পথে-ঘাটে, সাইকেলে, বাইকে, গাড়িতে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে, বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে মানুষ মুঠোফোন ঘেঁটে চলেছে। বিভিন্ন সমীক্ষার পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারছি— এই কু-অভ্যাসের ভয়াবহতা সম্বন্ধে। তা সত্ত্বেও এই যন্ত্রের ব্যবহার দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে; এদিকে স্বাধ্যায়ের মতো ব্যক্তি, পরিবার-সমাজ ও দেশ গঠনকারী একটি গুণ সমাজে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

কয়েকদশক আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি বই পাগলদের। যারা ফাঁক পেলেই বই খুলে পড়তে শুরু করতেন। রাস্তায়, স্টেশনে, দাঁড়িয়ে, বসে, সবরকম পরিস্থিতিতে আর নিরিবিলি পেলে তো কথাই নেই! গ্রন্থাগারের বই, চেনাশোনা লোকজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিনিময় করে পড়ার আনন্দ ছিল অনাবিল। প্রিয় লেখক-লেখিকাদের বই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নানান বিষয়ের লেখার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। এছাড়া ছিল পঠিত বিষয় নিয়ে আলোচনা। আড্ডা জমে উঠত প্রিয় লেখক-লেখিকাদের লেখনী শৈলী নিয়ে। কথা-বার্তায় উঠে আসত বিখ্যাত সুপাঠ্য উদ্ধৃতি। এখনও আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন যাঁরা এক-একজন চলমান গ্রন্থাগার-সম। সমাজে তাঁরা বিশেষ সম্মানীয়, তাঁদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। মা-সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য এইসব ব্যক্তিত্ব প্রায় সময়ই সঠিক সিদ্ধান্ত নেন এবং সমাজকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁরা পুস্তক পাঠ করেন, ই-বুক নয়।

মাত্র কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের বই-পড়ার নেশা ছিল মেয়েদের মধ্যে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল বাঙ্গালি ঘরের মেয়েদের কথা— মহিলামহলে তা আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবীর মতো লেখক-লেখিকাদের সাহিত্য চির নতুন। বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে তাঁদের অনায়াস সৃষ্টিকর্ম। তখন বাড়ির মহিলারা নিজেদের মধ্যে বই বিনিময় করে পড়তেন। গৃহকর্মের মাঝে দুপুরে খাওয়ার পরের সময়টা ছিল তাঁদের স্বাধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট। একপ্রস্থ সাংসারিক কাজ সেরে দ্বি-প্রাহরিক বিশ্রামের সময় পড়তেন বই। তালিকার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, কথামৃতের মতো গ্রন্থও ছিল। মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেদের চারিত্রিক সাদৃশ্য খুঁজে নিতে ভালোবাসতেন তাঁরা। আবার গৌরবময় চরিত্রগুলি অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। বর্তমানেও বিভিন্ন আয়ুবর্গের কিছু মেয়ে স্বাধ্যায় করে থাকেন। তাঁরা পরিবারের মধ্যে ও নির্দিষ্ট পাঠচক্রের মধ্যে ওই বিষয়ে আলোচনা করেন। এর ফলে তাঁরা নিজেরা ঋদ্ধ হন এবং অন্যদের মধ্যেও পুস্তকের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলেন। আশাপূর্ণাদেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুল কথার মধ্যে এখনও আমরা আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

এখন পুস্তক নির্বাচন হলো স্বাধ্যায়ের একটি অন্যতম মূখ্য বিষয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার পুস্তক সর্বকালে, সর্বযুগে পাওয়া যায়। সেগুলি যথেষ্ট সুখপাঠ্য হলেও সঠিক পুস্তকের নির্বাচন আমাদের করতে হবে; যেগুলি আমাদের মানসিক স্তরের উন্নতি ঘটায়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত লেখক-লেখিকাদের রচনা খুবই উপযোগী, তবে বর্তমানে অনেক লেখক-লেখিকা আছেন, যাঁরা আমাদের সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তাঁদের রচনাগুলি আমরা আমাদের পাঠ্যতালিকায় রাখতে পারি। প্রত্যেকদিন কমপক্ষে দশমিনিট হলেও বই পড়া বা স্বাধ্যায়ের জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ হব এবং পরিবারের সদস্য এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করব। নতুন প্রজন্মকে উপহার রূপে ভালো পুস্তক দিতে পারি। তারা বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন কোন্ পুস্তক পাঠ করেছে, সেটি তাদের কেমন লাগছে, সেবিষয়ে মতামত নিতে পারি। আমারাও মতামত জানতে পারি। নতুন প্রজন্মের স্বাধ্যায়কে সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব মূলত বাড়ির মায়েদের।

বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই পুস্তক ভাণ্ডার আছে। সেখানে যেন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীভগবৎ গীতা, শ্রীচণ্ডীর মতো ধর্মগ্রন্থের অবশ্যই উচ্চ স্থান থাকে। সেগুলির নিয়মিত পাঠ এবং আলোচনা আমাদের উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করবে। বহির্জগতের নৈরাশ্য থেকে দেবে মুক্তি। বইয়ের মাধ্যমে চেনা যায় লেখককে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে। সেজন্য ভারতবর্ষ চরম আত্মীয়তা অনুভব করে আমাদের মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে। সেই চরিত্রের নামে ডেকে উঠি আমরা পরিবারের সদস্যদের। স্বাধ্যায় হয়ে ওঠে জীবন্ময়! এই তো আমাদের জীবনের লক্ষ্য। □

দুশ্চিন্তা থেকে ডায়াবেটিস

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

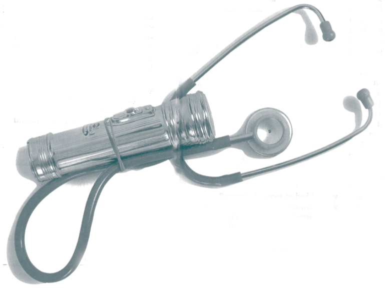

উঠতে বসতে চাপ। কম বয়সি থেকে বয়স্ক সকলেই চাপে আক্রান্ত। কিছু না কিছু নিয়ে জীবন জুড়ে দুশ্চিন্তা, অবসাদ নিত্যসঙ্গী। যা থেকে শরীরে বাসা বাঁধে রোগ। অসুখের তালিকার শুরুতেই ডায়াবেটিস। চিকিৎসকের দাবি, বর্তমানে ডায়াবেটিসের একটি অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর হলো স্ট্রেস। কোনো ধরনের চাপ পুষে রাখলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি, সেটা বোঝা জরুরি। চাপমুক্ত জীবনযাপন করলে তবেই সম্ভব মধুমেহ মোকাবিলা।

স্ট্রেস ফ্যাক্টর : যে কোনও কারণে মানসিক চাপ হলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন বেশি মাত্রায় বের হতে থাকে। কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন, এপিনেফ্রিন, গ্লুকাগন ইত্যাদি স্ট্রেস হরমোন অতিমাত্রায় নিঃসৃত হতে থাকে। এই প্রতিটি হরমোনই অ্যান্টি ইনসুলিন হরমোন। অর্থাৎ ইনসুলিন হরমোন রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। স্ট্রেস হরমোনগুলি ইনসুলিন হরমোনের কাজকে ব্যাহত করে। ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়তে থাকে।

কোন ধরনের চাপ দায়ী : ডাক্তারি পরিভাষায় স্ট্রেস দুই ধরনের হয়— শারীরিক ও মানসিক। খুব বেশিমাত্রায় মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বাড়িতে কেউ অসুস্থ, পরীক্ষার চাপ ইত্যাদির থেকে মনে প্রভাব পড়ে। কারও নিউমোনিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, হার্ট অ্যাটাক, দীর্ঘদিন থাইরয়েড বা অন্যান্য অসুখ শারীরিক স্ট্রেসের কারণ। যে কোনও ধরনের স্ট্রেস থেকে শরীরে হরমোনাল পরিবর্তন হতে থাকে। যা ডায়াবেটিস বা ব্লাড সুগারের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। বর্তমানে অল্প বয়সিরা বেশিরভাগই মানসিক চাপে আক্রান্ত। মানসিক চাপ নিজে নিজেই কমালে ভালো। তাহলে ডায়াবেটিস দূরে থাকে।

টাইপ টু থেকে সাবধান : মূলত স্ট্রেস থেকে টাইপ টু ডায়াবেটিসের সম্ভাবনাই বেশি। দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ বা দীর্ঘ কোনও অসুখে আক্রান্ত হলে তা থেকে হঠাৎ এই ডায়াবেটিস ধরা পড়তে পারে অথবা ডায়াবেটিস থাকলে তা হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে। মানসিক চাপ শরীরের ডায়াবেটিস কন্ট্রোল সিস্টেমকে খারাপ করে দেয়।

চাবিকাঠি : ডায়াবেটিস ও স্ট্রেস কমাতে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ব্লাড প্রেসারের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে। খুব বেশি মাত্রায় মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা অবসাদ হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। ডায়াবেটিস থাক বা না থাক ৩০ মিনিট নিয়মিত এক্সারসাইজ বা কায়িক শ্রম করা অত্যন্ত জরুরি। হাঁটা, সাঁতার কাটা, জগিং ও সাইকেল চালানো— যে কোনও একটি কাজ দিনে একবার অবশ্যই করুন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমোতেই হবে। বেশি রাত জাগা চলবে না। মদপান ও ধূমপান চলবে না। শৃঙ্খলাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

কারা আক্রান্ত : বয়ঃসন্ধির সময় থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের স্ট্রেস থেকে ডায়াবেটিস আক্রান্তের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক নানা কারণে স্ট্রেস হয়, যার ফলে বর্তমানে কম বয়সেও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। যাঁরা শিফট ওয়ার্কার, যাঁদের পারিবারিক চাপ রয়েছে ও অফিসে অতিরিক্ত কাজের চাপ, তাঁদের ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেশি। সম্পর্ক তৈরি বা সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার জন্য মানসিক চাপ ডায়াবেটিস ডেকে আনতে পারে। অবসাদ থেকে ডায়াবেটিসে মহিলা, পুরুষ সকলেই আক্রান্ত হতে পারে। তবে অবসাদ মহিলাদের বেশি হওয়ায় তাঁরা বেশি আক্রান্ত হন।

চাপের ডায়াবেটিসের লক্ষণ : ওজন কমে যাওয়া, বেশি তেষ্টা পাওয়া, খুব বেশি প্রস্রাব পাওয়ার লক্ষণের পিছনে ডায়াবেটিস হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই কোনও লক্ষণ থাকেও না। হঠাৎ করেই টেস্ট করে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। কেউ হঠাৎ করেই কোনও চাপে পড়লে, বা দেখা গেল কোনও কারণে হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন তখন ব্লাড সুগার লেভেল বাড়তে পারে। আবার সমস্যা মিটলে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক হয়। ডাক্তারি ভাষায় ডায়াবেটিস না বলে এই সমস্যাকে বলা হয় স্ট্রেস হাইপার গ্লাইসেমিয়া। এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ওষুধ খেতে লাগে না। তবে এক্ষেত্রে বা স্ট্রেস থেকে রক্তে সুগারের মাত্রা একবার বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই সাবধান থাকা জরুরি।

গর্ভবতী মহিলাদের মানসিক চাপ : এই সময় মহিলাদের শরীরে নানারকম হরমোনের পরিবর্তন ঘটে। পাশাপাশি মানসিকতারও নানা পরিবর্তন ঘটে। কেউ কেউ খুব চিন্তা করতে থাকেন, ফলে খুব সহজেই রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ইনসুলিন দিয়েই রোগীর চিকিৎসা করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের জন্মের পর মায়ের ব্লাড সুগারের মাত্রা কমে যায়। সেই হাইপোগ্লাইসিমিক অবস্থা থেকে যায় খুব কম জনের ক্ষেত্রে। গর্ভাবস্থায় মায়ের ব্লাড সুগারের মাত্রা বেশি থাকলে সন্তানের নানা সমস্যা দেখা দেয়। সন্তানের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্মের সম্ভাবনা থাকে, শিশুর আকার স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ো হতে পারে, জন্মের পর শিশুর নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তাই গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। ডায়েট, এক্সারসাইজ ও ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। দিনে ৪-৫ বার ব্লাড সুগার লেভেল বাড়িতেই চেক করে দেখা উচিত।

স্ট্রেস কমাতে : ● এক্সারসাইজ একদিকে যেমন ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে তেমনই মানসিক চাপ কমাতেও অত্যন্ত উপকারী। তাছাড়াও মেডিটেশন, যোগ ব্যায়াম স্ট্রেস কমাতে অত্যন্ত জরুরি।

● নিজের যা শখ বা যে কাজ করতে সবচেয়ে ভালো লাগে সেই কাজ দিনে অন্তত একবার অবশ্যই করুন।

● সময় পেলেই বেড়াতে যান। বসে সময় কাটানো নয়, কায়িক শ্রম প্রয়োজন। এমন কিছু করুন যাতে শারীরিকভাবেও সক্রিয় থাকা যায়।

● বেশিক্ষণ মোবাইল, ইন্টারনেটে সময় কাটানো উচিত নয়। □

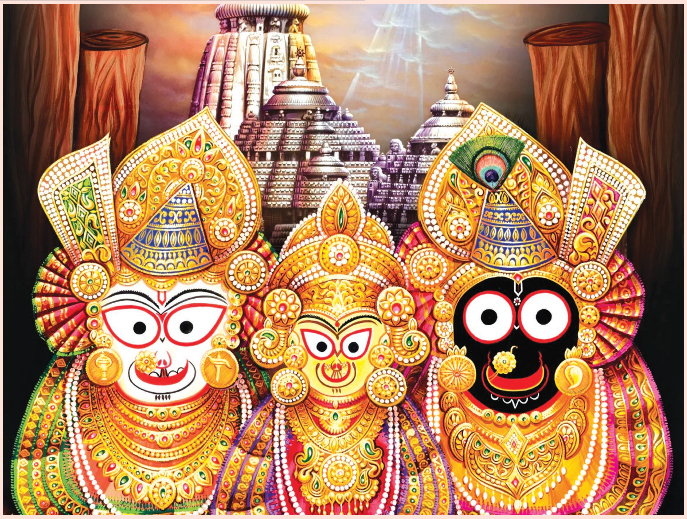

মহাপ্রভু জগন্নাথ এবং আচার্য শ্রীরামানুজ

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

দ্বাদশ শতাব্দী। শ্রীরামানুজ শ্রীক্ষেত্রে এলেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁর জন্ম, ব্রাহ্মণ বংশে। বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব সাধক। তিনি আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে কিছুটা পরিবর্তিত করে নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত, প্রচারিত। তাঁর বেদান্ত-ভাষ্য 'শ্রীভাষ্য'। তাঁর সম্প্রদায়ের নাম শ্রী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের সবার উপরে গুরুপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবী। তাঁর প্রচারিত শ্রী সম্প্রদায়ের কাছে ব্রহ্ম হলেন ভক্তবৎসল শ্রীবিষ্ণু। শ্রীরামানুজ পুরীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। এখানে একটি মঠও তিনি স্থাপিত করেন, যা এমার মঠ নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীমন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

আচার্য রামানুজ প্রায়ই জগন্নাথ দর্শনে যেতেন। জগন্নাথ তাঁর কাছে মহাবিষ্ণু। কিন্তু জগন্নাথের পূজার্চনার কিছু দিক তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। ভারতীয় ধর্ম সমন্বয়ের পরমবিগ্রহ, অর্চাবতার দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, সেখানে বিবিধ প্রথা, রীতিনীতি, বিধিবিধান মিলিত হয়েছে। প্রভু জগন্নাথের সেবক রাজাও আছেন। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শবরও আছেন, যাঁরা দয়িতা, দয়িতাপতি নামে পরিচিত। বৈদিক বিধান আছে, আবার তান্ত্রিক রীতিনীতিও আছে। সবকিছুতেই প্রভুর পরম পরিতোষ। এভাবেই চলে আসছে বহু যুগ থেকে। কিন্তু আচার্য রামানুজ বেঁকে বসলেন। তাঁর এসবে তীব্র আপত্তি। শ্রীবিষ্ণুর সাধনায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম, অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের উপস্থিতি এসব অন্যায়, অনুচিত ও শাস্ত্রবিরোধী। বেদবহির্ভূত এসব অদ্ভুত রীতিনীতি অবিলম্বে নিষিদ্ধ হওয়া কাম্য। এই অব্যবস্থার অবসান চেয়ে শ্রীরামানুজ পুরীর রাজা চোড়গঙ্গদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সেই সময় সাধক ও পণ্ডিত হিসেবে রামানুজের সমগ্র দেশে খ্যাতি ছিল। পুরীর রাজাও তাঁকে পরমশ্রদ্ধা করতেন। রাজার উপর রামানুজের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল। চোড়গঙ্গদেবকে আচার্যদেব জানালেন— পরমবিষ্ণু জগন্নাথের আরাধনা কেবল বৈদিক বিধানে হওয়াই শাস্ত্রসম্মত এবং অন্ত্যজ দয়িতাদের এই পূজার্চনায় অংশগ্রহণও আপত্তিজনক। কাজেই এইসব বন্ধ হওয়া দরকার।

রাজা চোড়গঙ্গদেব বিনা দ্বিধায় একবাক্যে আচার্যদেবের কথায় সায় দিলেন এবং স্থির হলো— একটি নির্দিষ্ট তিথিতে রামানুজ প্রবর্তিত প্রথায় জগন্নাথের পূজার্চনা শুরু হবে। কিন্তু এই বিধান দয়িতাপতিগণ মানতে পারলেন না। তা পুনর্বিবেচনার জন্য রাজাকে তাঁরা অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজা তাঁদের কথায় কান দিলেন না। নিরুপায় হয়ে দয়িতারা প্রভু জগন্নাথের শরণ নিলেন, তারপর তাঁরা পুরীর বিশিষ্ট সাধিকা নিতেই ধোপানির কাছে গেলেন। সেই সময় উচ্চকোটির জগন্নাথ-সাধিকা হিসেবে পুরীর জনমানসে নিতেই ধোপানির উচ্চ আসন ছিল। দয়িতাদের কথা শুনে সাধিকা কিছুক্ষণ নীরব থেকে আশ্বাস দিলেন— তোমরা দুঃখ করো না। যেভাবে জগন্নাথের পূজার্চনা হয়ে আসছে তা কোনো মানুষের দেওয়া বিধান নয়। স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন— তাই আজও পালিত হয়ে আসছে। কোনো মানুষের পক্ষে এই পূজার্চনার পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রভু যদি চান তবেই পরিবর্তন হবে। আর এ বিষয়ে প্রভুর ইচ্ছা অচিরেই প্রকাশ পাবে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে রাজা চোড়গঙ্গদেব অতি প্রত্যূষে পাত্র-মিত্র- অমাত্য-সহ মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির, উপস্থিত ব্রাহ্মণ সেবকরাও। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। কেবল শ্রীরামানুজ গরহাজির। তাঁর আসার পথ চেয়ে সবাই অপেক্ষা করছেন। কিন্তু কোথায় তিনি? সকাল যে গড়িয়ে যায়! প্রভুর ভোগরাগ সেবা হবে কখন? রাজা চিন্তিত। বাকিরাও উদ্বিগ্ন। কিন্তু রামানুজের দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা চলে না। রাজা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে পুরানো বিধিতে পূজা করার নির্দেশ দিলেন। দয়িতারা 'জয় জগন্নাথ' বলে সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিলেন।

কিন্তু রাজা ভাবতে লাগলেন— আচার্যদেব কোথায় গেলেন? তাঁর কী হলো? এমার মঠে তাঁকে পাওয়া গেল না। অবশেষে দেখা গেল, পুরী থেকে চার-পাঁচ মাইল দুরে ভার্গবী নদীর তীরে বালি শয্যায় তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মতান্তরে তাঁর সন্ধান মিলেছিল দক্ষিণ ভারতের কূর্মক্ষেত্র নামে একটি গ্রামে। তিনি জানান— শ্রীজগন্নাথ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভর্ৎসনা করে বলেন— আমার পূজাপদ্ধতি পরিবর্তন করার তুই কে? আমার ভক্তরা প্রথম থেকে যেভাবে পূজা করে আসছে, সেই ভাবেই তাদের করতে দে। আর তোর এখানে থাকার দরকার নেই। তুই এখান থেকে চলে যা।

এরপর শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় তাঁকে তুলে এনে পুরীর বাইরে রেখে যান। শ্রীরামানুজাচার্য তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে বললেন— হে প্রভু, হে পুরুষোত্তম, তুমি সবার পূজ্য, সবার নাথ। তাই তুমি জগন্নাথ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি আমায় ক্ষমা করো। জগন্নাথ, তোমাকে প্রণাম— জগন্নাথায় তে নমঃ। ■

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

প্রদীপ মারিক

রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরায় পুরীর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী, যিনি রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন, তিনি প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথের সামনে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখ পথে ঝাঁট দেওয়ার পরই রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অতি পবিত্র। কারণ তিনটি রথেই বিরাজ করেন সমস্ত দেবতা। তাই এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানার অর্থ সমস্ত দেব-দেবীর চরণ স্পর্শ করার পুণ্য অর্জন করা। ওড়িশার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'-এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল সত্যযুগে। সে সময় ওড়িশা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকেই বঙ্গপ্রদেশেও রথযাত্রার সূচনা।

চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বঙ্গদেশে নিয়ে আসেন। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বঙ্গে পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বঙ্গের বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়। রথ এসে পৌঁছায় মন্দিরের সামনের বড়ো রাস্তায়। রাজা গজপতি উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির। গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিলোমিটার। আবার উলটো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছান শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথের নির্মাণ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হয় মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে। আর সেই কাঠগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা শুরু হয় রামনবমী তিথি থেকে। রথগুলিতে অন্য কোনও ধাতু ব্যবহার করা হয় না। রথের পেরেকও তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। প্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা এই তিন দেবতাকে উৎসর্গীকৃত তিনটি রথ সম্পূর্ণ করতে লাগে প্রায় দুই মাস। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি অসমাপ্ত মূর্তিই প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের। কলির মানুষের দুঃখ, তাপ পাপ মোচনকারী প্রভু জগন্নাথ সর্ব সাধারণের মাঝে নেমে আসেন, তাই মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রা দর্শন করা এবং প্রভুর নামকীর্তন করা এবং রথের রশি ধরলে পুণ্যার্জন করা হয়।

রথযাত্রা হলো অন্যতম প্রধান ভারতীয় ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সাড়ম্বরে পালন করা হয়। কালক্রমে এই উৎসব হয়ে উঠে মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ রথযাত্রা। এই রথযাত্রার প্রাচীন কাহিনি এইরকম— এক বিশেষ সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম বা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা এবং দ্বারকাবাসীকে নিয়ে

AASHIRVAAD

কুরুক্ষেত্রের পবিত্র দ্বৈপায়ন হ্রদে পুণ্যস্নানে যান। সেই সময় এই পুণ্যস্নানে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। তারা জানতে পারে কুরুক্ষেত্রে এই পুণ্যস্নানে তাদের নয়নের মণি ব্রজের গোপাল শ্রীকৃষ্ণও এসেছেন। এখানে বৃন্দাবনের ব্রজবাসীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। তারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে মহা আনন্দে আত্মহারা। ব্রজবাসীরা ঠিক করলো শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ব্রজধামে নিয়ে যাবে। রথে আসীন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রার রথের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই রথের রশি টেনে বৃন্দাবনে নিয়ে আসে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর অগ্রজ বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন স্মরণে এই রথযাত্রা উৎসব আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির-সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ , বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র মূর্তি মন্দিরের বাইরে সর্বসমক্ষে আনা হয়। তারপর তিন জনকে আলাদা তিনটি সুসজ্জিত রথে বসিয়ে দেবতাদের পূজা সম্পন্ন করে রথ টানা হয়। পুরীর রথযাত্রা উৎসবে মূল দর্শনীয় এই সুসজ্জিত তিনটি রথ। রথ তিনটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাত্রার প্রথমে থাকে অগ্রজ বলরামের রথ। এই রথের নাম হলো তালধ্বজ। এতে মোট চোদ্দোটি চাকা আছে এর উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথটি নীল রং দ্বারা আবৃত। বলরামের পিছনে থাকে ভগ্নী সুভদ্রার রথ। এই রথের নাম হলো দর্পদলন রথ। এতে মোট বারোটি চাকা আছে এর উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট। সুভদ্রার রথটি ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা আছে তাই এই রথটির আরেক নাম হলো পদ্মধ্বজ। রথটি লাল রং দ্বারা আবৃত। সবার পিছনে থাকে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ। এই রথের নাম হলো নন্দীঘোষ। পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা আছে, সেজন্য এই রথের আরেক নাম হলো কপিধ্বজ রথ। এই রথে মোট ষোলোটি চাকা আছে প্রতিটি চাকার ব্যাস সাত ফুট, এর উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। রথটি হলুদ রং দ্বারা আবৃত।

তিনটি রথের রং ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি উপরিভাগের অংশ লাল রং দ্বারা আবৃত। রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কঠোপনিষদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে মানুষের দেহ হচ্ছে একটি রথ এবং ঈশ্বর হচ্ছেন তার সারথী, যিনি এই ভবসাগর পরিভ্রমণ পরিচালনা করেন। আত্মা হচ্ছে পরিভ্রমণকারী এবং দেহ তা ধারণ করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করে। প্রাণশক্তি, পরধর্মসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সমতা, প্রশান্তিকে ধারণ করে যেই দেহধারী সঠিক পথ ধরে পরিক্রমা করতে পারে সেই রথ ঈশ্বরের নির্ধারিত আবাসস্থলে পৌঁছাতে পারে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুলোকে বা নিত্যধামে গমন করে মহামিলনের মাধুরী আস্বাদন করতে পারবে, জীবন হবে ধন্য। এমন একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা লালন করে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রভু জগন্নাথকে রথে আসীন অবস্থায় দর্শন করতে বা রথের রশি ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনও দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের বিশ্বাস রথে আসীন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করে পরম পুণ্য প্রাপ্তি হয়।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করলে এই জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। সংস্কৃত ভাষায় রথ মানে শকট এবং যাত্রা মানে মিছিল। ক্ষণিকের জন্য জগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করাকে বহু পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতই পবিত্র যে, কেউ যদি এই দিনে রথ স্পর্শ করেন অথবা এমনকী রথের দড়ি স্পর্শ করেন, তাহলে বহু পুণ্য কর্মের ফল লাভ করতে পারেন। কথিত আছে রথযাত্রার দিন যদি রথের রশি ছোঁওয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ হয়। রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মোক্ষ লাভ হয় বলেও বর্ণিত রয়েছে। ■

ABRSM
অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ
(বিদ্যালয় শিক্ষা)
রেজিস্ট্রেশন নং S/25125/1993

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র দ্রুত বাস্তবায়ন, শিক্ষায় ধর্মীয় তোষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, শিক্ষাক্ষেত্রে শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে অবিলম্বে নিয়োগ, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সামাজিক সম্মান-সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, এক দেশ এক বেতনক্রম চালু এবং বকেয়া ৩৬ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডি.এ.) প্রদানের দাবিতে গত ২৩ জুন সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হয় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (এবিআরএসএমের) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বার্ষিক সাধারণ সভা। জেলার বিভিন্ন সার্কেল থেকে ১৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং এবিআরএসএমের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়। জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মৃধা গত এক বছরের সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাঠ করেন। জেলায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত সমস্যা ও সমাধান, বিগত বছরের কার্য সমীক্ষা এবং আগামী বছরের যোজনা বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এবিআরএসএম (বিদ্যালয় শিক্ষা)-র রাজ্য সহ-সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল, রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, কলকাতা বিভাগ সহ-প্রমুখ অলোকেন্দু অধিকারী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সদ্‌ভাবনা প্রমুখ কর্ণধর মালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ শিক্ষক সুকুমার নস্কর। একটি সুদৃশ্য স্যুভেনিয়ার উন্মোচন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি প্রবোধ চন্দ্র মুদি। জেলার ৫১টি সার্কেলে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ জনের জেলা সমিতি ঘোষণা করা হয়। এই জেলা সমিতির সভাপতি হিসেবে প্রবোধ চন্দ্র মুদি, সম্পাদক অভিজিৎ মৃধা ও কোষাধ্যক্ষ সহদেব সিংহ পুনর্নির্বাচিত হন।

সংস্কার ভারতী
ব্রহ্মচারীকরুণানন্দসরস্বতীশিশুমন্দির

সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গের প্রান্ত বৈঠক

মুর্শিদাবাদ জেলা-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংস্কার ভারতীর বর্ধিত প্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জিয়াগঞ্জের ব্রহ্মচারী করুণা সরস্বতী শিশু মন্দিরে। বৈঠক শুরু হয় ২১ জুন এবং সমাপ্ত হয় ২২ জুন বিকেলে। এই মহতী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় লোককলা প্রমুখ সঙ্ঘ প্রচারক নিরঞ্জন পণ্ডা, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী উদয় দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় কুমার নন্দী, প্রান্ত সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার, সর্বব্যবস্থা প্রমুখ নীলকণ্ঠ রায় যিনি পূর্বক্ষেত্র প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন। এই বৈঠকে বিভিন্ন জেলা থেকে ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

খড়্গাপুরে লোকপ্রজ্ঞার ১৮তম অনুভব দর্শন

গত ১৫ ও ১৬ জুন খড়্গাপুর আইআইটির সভাগৃহে অখিল ভারতীয় প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক অনুকূল ও অনুপম অনুষ্ঠান 'অনুভব দর্শন'। যথার্থভাবেই এই সম্মেলন হয়ে ওঠে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গরিমা ও জ্ঞান-পরম্পরা সম্পর্কিত এক বিশেষ বর্ণময় অনুষ্ঠান।

১৫ তারিখ সকাল দশটায় সংগঠন মন্ত্র ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুভব দর্শনের শুভ সূচনা হয়। প্রবুদ্ধ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন- খড়্গাপুর আইআইটির নির্দেশক অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন আইআইটির ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কমল লোচন পাণিগ্রাহী, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, কলকাতার নির্দেশক অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ মিশ্র, বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিষয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ভোপালের প্রাক্তন অধ্যাপক সদানন্দ সপ্রে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক অধ্যাপক সরূপ প্রসাদ ঘোষ ও ড. রাসবিহারী ভড় । এছাড়া সভাগৃহ পূর্ণ ছিল লোকপ্রজ্ঞার বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র থেকে আগত ৪০০ জন সংযোজক, সহ-সংযোজক, সদস্যবৃন্দ, আইনজীবী, বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী-সহ বহু প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্বে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক কমল লোচন পানিগ্রাহী। তারপরে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক বীরেন্দ্র তেওয়ারি তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এই আইআইটি কীভাবে গড়ে উঠল, শিক্ষাক্ষেত্রে তার কী কী অবদান এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষার ওপর যথাযথ মনোনিবেশ করলে যে তার শিক্ষাগত ভিতটা সবচেয়ে শক্ত হয় এবং যে কোনো বিষয়ে সে এগিয়ে যেতে পারে,সেই বিষয়ে মূল্যবান মতামত দেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. রাসবিহারী ভড়। এরপর খড়্গাপুর আইআইটির ওপরে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। খড়্গাপুর আইআইটির প্রতিষ্ঠার লগ্ন এবং তার আগে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সকলের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজনের পর অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ মিশ্র ভারতের শিক্ষানীতি এবং ভারতের জ্ঞানপ্রণালীর ওপর দীর্ঘ বক্তব্যে জাতীয় শিক্ষানীতির বিষয়বস্তু, কীভাবে এই নীতি রূপায়ণ করলে ভালো হয় এবং তার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা কীভাবে মিলিত হয়েছে তার সন্ধান দেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপত প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ভারতীয় জ্ঞানপ্রণালীর চিরন্তনতা'। এদিনের শেষ বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সরূপপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ম্যান মেকিং অ্যান্ড নেশন বিল্ডিং'। পরের দিন, ১৬ জুন, লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক অধ্যাপক সোমশুভ্র গুপ্ত লোকপ্রজ্ঞার একটি সামগ্রিক রূপরেখা সকলের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। অধ্যাপক সদানন্দ সপ্রে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে প্রজ্ঞাপ্রবাহের ভূমিকা নিয়ে সুদীর্ঘ ও সুন্দর একটি বক্তব্য তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে যারা স্থান করে নিয়েছেন, সেই কৃতিদের এবং 'রত্নগর্ভা মাতৃ সংবর্ধনা'র মাধ্যমে কৃতীদের মায়েদের সম্মান জানানো হয়। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে সম্মাননা উপহার, শংসাপত্র, উত্তরীয় ও ভারতমাতার প্রতিকৃতি তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

বারবার করতালির মধ্য দিয়ে প্রায় ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সপরিবারে সম্মাননা জ্ঞাপন এক অতুলনীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে খড়্গাপুর আইআইটির নির্দেশক অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পূর্ণ বন্দেমাতরম ও শান্তি মন্ত্রের মধ্য দিয়ে দু'দিনের 'অনুভব দর্শন-১৮' শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও সহায়তায় ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ, বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ড. আনন্দ পাণ্ডে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিলন কুমার দে।

সংস্কৃতভারতী-দক্ষিণবঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১০ জুন থেকে ২২ জুন হালিশহর-স্থিত শ্রীনিগমানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত ১২ দিনের আবাসীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঠের মোহন্ত মহারাজ স্বামী ব্রজেশানন্দ সরস্বতী । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় তকনীকি শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অনুসন্ধান সংস্থান বা এনআইটিটিটিআর, কলকাতার নির্দেশক ডাঃ দেবীপ্রসাদ মিশ্র। মুখ্য বক্তা ছিলেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত অধ্যক্ষ ডাঃ তন্ময় কুমার ভট্টাচার্য। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহেও প্রায় ১৫০-এর অধিক বেশি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সর্বদা প্রশিক্ষণের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন সকল শিক্ষার্থী। সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঠের সম্পাদক স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী। প্রধান অতিথি ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গৌতম চন্দ্র এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক ড. পি. নন্দকুমার, পূর্বক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। এই বারো দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে বর্গাধিকারী ছিলেন মেদিনীপুর বিভাগ সংযোজক অরুণ চক্রবর্তী।

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মাতৃশক্তি প্রশিক্ষণ বর্গ

কোচবিহার জেলার সারদা নগরে গত ২১ জুন থেকে শুরু হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্তের তিনদিনের প্রান্তীয় মাতৃশক্তির প্রশিক্ষণবর্গ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বর্গের শুভ সূচনা করেন ক্ষেত্রীয় মাতৃশক্তি সহ-সংযোজিকা সরোজ সোনি। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মাতৃশক্তি পালক কার্যকর্তা লক্ষ্মণ বনশল। শিক্ষিকা হিসেবে ছিলেন সরস্বতী রাজগোট ও রত্না তিরকি। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের এই বর্গে ২৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বর্গের প্রতিদিন তথ্য আদান-প্রদান সত্র, বৌদ্ধিক সত্র, চর্চা সত্র, প্রবজন ও সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। বর্গের প্রথম দিন ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। ভারতের ইতিহাস, সামাজিক সমরসতা, কুটুম্ব প্রবোধন সম্পর্কিত আলোচনা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তির সংকল্প, হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্ব, লাভ জেহাদ-সহ আরও নানা বিষয়ে এই বর্গে শিক্ষাদান করা হয়। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন পরিষদের উত্তরবঙ্গ মাতৃশক্তি সহ-সংযোজিকা মৌমিতা মিত্র দত্ত। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল, উত্তরবঙ্গের মঠ-মন্দির প্রমুখ অর্চন রায়, প্রান্তের ও জেলার কার্যকর্তা-সহ বিশিষ্ট-জনেরা। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও সৎসঙ্গ প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্গের সমাপ্তি হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
াতৃশক্তি প্রশিক্ষণ বর্গ
উত্তরবঙ্গ প্রান্ত

রামমোহন লাইব্রেরি সভাগারে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন

বৈভবী শাম্ভাবী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে, নিও ন্যাশনালিস্ট ও ভয়েস অফ হিন্দুস্থানের সহযোগিতায় গত ২০ জুন সন্ধ্যায় মানিকতলার রামমোহন লাইব্রেরি সভাগারে অনুষ্ঠিত হলো একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা— 'ফিরে দেখা- ২০শে জুন, ১৯৪৭'। পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মোহিত রায়, অধ্যাপিকা ও গবেষক ড. প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবজিৎ সরকার। উপস্থিত বক্তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ গঠনে বঙ্গসন্তান ও শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য ভূমিকা ও অবদানের বিষয়টি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন। বর্তমান অস্থির ও উদ্বেগজনক রাজনৈতিক পরিবেশে এবং ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রিক বিভিন্ন রকমের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ জুনের ইতিহাস স্মরণ, এই দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি এবং গোটা রাজ্য জুড়ে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন'-এর অপরিসীম প্রয়োজনীয়তার কথা এই সভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওসমান মল্লিক।

সক্ষমের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হলো সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে সক্ষমের প্রতিষ্ঠা দিবস। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যে সংস্থা সারা ভারতের দিব্যাঙ্গ সমাজের কাজের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২০ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গত ২০ জুন তার ১৬তম বর্ষ পূর্ণ হলো। এই দিন জলপাইগুড়িতে সুভাষ ভবনে অষ্টবক্র মুনি ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয় গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক কিরণচন্দ্র মহাশয়। সক্ষমের স্থাপনা দিবস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ। অনুষ্ঠানে এই বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছয় জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সক্ষমের সদস্য জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কেও সক্ষমের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সক্ষমের সদস্য আশিস দেবদাস ও সোনা সেন। জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে রায়গঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার ও শিলিগুড়ি জেলাতে সক্ষমের স্থাপনা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়।

দিবাঙ্গ সেবা কেন্দ্র
জলপাইগুড়ি
ভারত
9434228573

BAUDDHA DHARMANKUR SABHA OF INDIA
1, Buddhist Temple Street, Kolkata - 700 012
159 Birth Anniversary of it's Founder
Ven'ble Karmayogi Kripasaran Mahasthavir
On Saturday, 22nd June 2024 / 2568 BE, 4:30 pm, Kripasaran Hall
13th Kripasaran Memorial Lecture 2024 will be Delivered by
VEN. BHIKKHU SUNANDAPRIYA General Secretary, Bangladesh Buddhist Federation, Dhaka
Kripasaran Award for Social Excellence 2024 will be presented to
VEN. ANANDA BHIKKHU
DR. SUMANAPAL BHIKKHU
CULTURAL PROGRAMME

কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

বাঙ্গালি বৌদ্ধদের সংস্থা— বেঙ্গল বুদ্ধিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন ‘বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া’ গত ২২ জুন ১, বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-১২-স্থিত কৃপাশরণ সভাগৃহে আয়োজন করে। কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের ১৫৯তম পুণ্য জন্মজয়ন্তী। কৃপাশরণ ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (প্রতিষ্ঠা ১৮৯২)। সভাপতিত্ব করেন ড. রতনশ্রী মহাথেরো। উপস্থিত ছিলেন ভিক্ষু সুমনপ্রিয়, আনন্দ ভিক্ষু, ড. সুমনপাল ভিক্ষু ও অমলেন্দু চৌধুরী। সভায় ১৩তম কৃপাশরণ স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়। ‘কৃপাশরণ অ্যাওয়ার্ড ফর সোশাল এক্সেলেন্স, ২০২৪’ সম্মানে সম্মানিত হন ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বুদ্ধগয়ার সাধারণ সম্পাদক আনন্দ ভিক্ষু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

विश्व हिंदू परिषद
सामाजिक समरसता अभियान
केन्द्रीय बैठक

সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় বৈঠক

গত ২২ ও ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় বৈঠক। মুম্বই শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর বহুমুখী সেবা প্রকল্প ‘কেশব সৃষ্টি’-তে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। সারা দেশের ৩০টি প্রান্ত থেকে ১৩০ জন বিভাগ তদূর্ধ্ব সমরসতা প্রমুখ এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী মিলিন্দ পরাণ্ডের উদ্বোধনী ভাষণের দ্বারা শুরু হয় বৈঠক। সহ-সংগঠন মহামন্ত্রী ও সমরসতার পালক কার্যকর্তা বিনায়ক দেশপাণ্ডে কখন অস্পৃশ্যতা বিদেশিদের দ্বারা কীভাবে ভারতীয় সমাজে শেকড় গেড়েছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সমরসতা নির্মাণে এবং সবরকম বিপদের হাত থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষায় সাধুসন্তদের অবদান বিনায়কজীর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। দেশব্যাপী সমরসতার কাজের ক্ষেত্রে কী করণীয় সে বিষয়ে বক্তব্যের শেষে আলোকপাত করেন। সমরসতার কেন্দ্রীয় প্রমুখ দেবজীভাই রাওয়াত পুরো বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন।

এই বৈঠকে সমরসতার বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞ কার্যকর্তা রমেশ পতঙ্গের তরফে পাওয়া যায় গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দিকনির্দেশ। কলকাতা ক্ষেত্র প্রমুখ গৌতম সরকার, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সমরসতা প্রমুখ উৎপল সানি, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ মহেন্দ্র পাণ্ডে এবং বর্ধমান বিভাগ প্রমুখ শান্তি সিকদার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আগামী ৬ মাসের লক্ষ্য স্থির করে বৈঠক সমাপ্ত হয়।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

শ্রীশ্রীজগন্নাথ রূপলীলা

বিমলকৃষ্ণ দাস

‘নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ।।’

জগৎনিয়ন্তা প্রভু জগন্নাথ, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য সদা সঞ্চরণশীল, কালের গতি যাঁর সমাশ্রিত, যিনি যুগে যুগে সাধুকুলের পরিত্রাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; যাঁর কনককান্তি সুদর্শন চক্র সূর্যেরই প্রতিরূপ— সেই ভগবান পাতক উদ্ধারে পুরীধামে কেন এমন রূপ ধারণ করলেন! যেন বোঝাতে চাইছেন— ‘আমার অসম্পূর্ণ পদযুগলে চলার সামর্থ্য নেই, অর্ধসমাপ্ত হস্ত দ্বারা কিছু করারও শক্তি নেই, আমি স্থবির, আমি অচল। কিন্তু এতো হতে পারে না, এটা ঠিক জগৎ প্রভুকে আমরা দেখতে চাই সাকার, নানা মূর্তিরূপে; আসল রূপে তিনি থাকেন আমাদের হৃদয়ে, চিন্তনে মননে, কিন্তু তাহলে এখানে তিনি এমন রূপ পরিগ্রহ করলেন কেন!

আমরা জানি সে কাহিনি। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের দর্শনে আকুল হলে একদিন স্বপ্নাদেশে তাকে দারুমূর্তি নির্মাণের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রভুর নির্দেশে তিনি নির্দিষ্ট নিমকাঠ সংগ্রহ করে শিল্পীকে (কেউ বলেন শিল্পী যিনি স্বেচ্ছায় এই মূর্তি নির্মাণে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি আর কেউ নন স্বয়ং জগন্নাথ, আবার কেউ বলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা) শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি নির্মাণে অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হলেন— এক শর্ত সাপেক্ষে, ২১ দিনের আগে তার নির্মাণ গৃহের দরজা কেউ খুলতে পারবে না। চোদ্দ দিনের মাথায় শিল্পীর ঘরে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে, সকলে বিশেষ করে রানিমা সন্দিগ্ধ তথা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার পীড়াপীড়িতে রাজা দরজা খুললেন— দেখলেন অসম্পূর্ণ হস্তপদ সমন্বিত মূর্তি। শিল্পী অদৃশ্য। রাজা যারপরনাই কাতর হয়ে পড়লেন। রাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাকে আবার স্বপ্নাদেশ দিয়ে জানালেন— কথা রক্ষা করতে না পারার জন্য এই বিভ্রাট। এই মূর্তিতেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম রূপে পূজা গ্রহণ করবেন।

এই হলো ভগবান জগন্নাথদেবের মূর্তি-রূপ পরিগ্রহের কাহিনি। কিন্তু ভগবান, আমরা কি বলতে পারি না আমরা সংসারে এই নবরূপের মাধুর্য উপস্থাপনে তোমারই ইচ্ছা কাজ করেছে! হিংসা, দ্বেষ, অহংকারের পৃথিবীতে তোমার নবরূপ-বিগ্রহ সকলের পরিত্রাতা রূপে প্রতীয়মান হবে এই তোমার ইচ্ছা। নতুবা যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তিনি হস্ত পদহীন, তা কোনো প্রচ্ছন্ন বার্তা ছাড়া কী করে হয়! সে বার্তা হলো— যারা ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অঙ্গহীন, যারা অঙ্গ থেকেও পঙ্গু, যারা নিরাশা, হীনতাবোধ, আত্মগ্লানির অশ্রুধারায় নিত্য নিজেকে সিক্ত করে, তাদের কাছে যেন তিনি প্রেরণার মূর্তি হয়ে আবির্ভূত হলেন। যেন বললেন— ‘দেখ, আমিও তো তোমাদের মতো, তাতে আমার এই জগৎ চালনায় তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তবে তোমাদের শুধু নিজের জীবন চালনায় সমস্যা হবে কেন? প্রতীয়মান করতে চাইলেন— সমস্ত দুর্বল, শক্তিহীনের তিনি প্রেরণা, তিনি শঙ্কাহরণ, তিনি অভয়দাতা। এও বার্তা দিলেন— শক্তি সামর্থ্য শুধু হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে থাকে না। তা গচ্ছিত থাকে হৃদয়ের গোপন কুলুঙ্গিতে। আমরা হয়তো জানি প্রভু জগন্নাথদেবের এই দারুমূর্তির বক্ষ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে ব্রহ্মরূপ শিলা, যা নেপালের রাজা ওড়িশারাজ যযাতি কেশরীকে দিয়েছিলেন।

একবার শঙ্করাচার্য ও রাজা যযাতি কেশরী নেপালে গেলে সেখানকার রাজা কয়েকটি শালগ্রাম শিলা ওড়িশারাজের হাতে তুলে দেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বক্ষদেশে মন্ত্রপূত এই শালগ্রাম শিলা ব্রহ্মজ্ঞানে স্থাপন করা হয়। বারো বছর পরে নব কলেবরের সময় এই শিলা পুনঃ স্থানান্তরণ করা হয়। প্রভু জগন্নাথের সংকেত বড়ো স্পষ্ট— ‘সত্য’কে বহিরঙ্গে নয়, হৃদয়ে ধারণ করতে হয়। আর সেই ‘সত্য’কে উচ্চ-নীচ, ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একসঙ্গে সবাইকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। একসঙ্গে— তবেই জগতের মঙ্গল হবে। তাইতো রথযাত্রার আয়োজন। কণ্ঠে প্রভুর নাম কীর্তন,— সবাই রথের দড়ি টেনে নিয়ে চল্‌ল গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে

(মাসিবাড়ি)। ঠিক এমনি সত্যাধারিত হয়ে তুমি তোমার জীবন রথকেও নিয়ে চল লক্ষ্য পর্যন্ত। মাসির বাড়ি— মাতৃভবন তুল্য, যেখান থেকে আসা, সেখানে ফেরা— এটাই জীবন।

পরমাত্মার কাছে পৌঁছতে এই জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হয়। আসলে রথযাত্রা হলো জীবন-যাত্রারই প্রতীক। জীবনরথ নানা ইন্দ্রিয় অনুভূতি, বোধ, প্রকৃতিরূপী চাকার সহায়ে এগিয়ে চলে। রথযাত্রায় প্রত্যেকের রথের আলাদা নিজস্ব ধ্বজা থাকে— একেকটি এক রঙের, দূর থেকে বোঝা যায় কার রথ। তেমনি জীবনাদর্শ, জীবন বৈশিষ্ট্য, ত্যাগ, সেবা কর্মের ধ্বজরূপী বৈশিষ্ট্য দেখে মানুষ মানুষকে চেনে, জীবন পথে একা চলা যায় না, সঙ্গে চলার সবচেয়ে ছোটো একক হলো পরিবার। আর পরিবার দিয়ে তৈরি হয় সমাজ-রথ— সবাই মিলে টানলে তবে সে এগোবে। প্রভু জগন্নাথ, তাঁর জ্যেষ্ঠ বলরাম এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে ছাড়া রথযাত্রায় সম্মিলিত হন না। এর মধ্যে তাঁর বার্তাটি স্পষ্ট— একটি সুসংহত পরিবার একটি সংহতিপূর্ণ সমাজ তৈরি করতে পারে। আর সংহতি সম্পন্ন, আত্মীয়বন্ধনে আবদ্ধ সমাজ একটি বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনির্মাণে সমর্থ হয়।

রাষ্ট্রদেবতা প্রভু জগন্নাথ। ভেদ নেই, বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, অচ্ছুত নেই। হৃদয়ের মাঝে যেন নির্মল আকাশ সূর্যকরোজ্জ্বল এক ধরণী নিরন্তর স্থাপন করে চলেছেন তিনি। পুরুষোত্তম ভগবান সকলকে ভাবতে শেখালেন— 'আমি নয়, তুমি', 'আমরা' নয় 'তোমরা'। একা নয়, একসঙ্গে। যেন সেই উপনিষদ বার্তা— 'একসঙ্গে চল, একসঙ্গে বলো, হোক মন একাকার।' অন্নগ্রহণ সকলের কথা ভেবে, সবাইকে নিয়ে। তাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বলা হয়— 'জগন্নাথ কা ভাত জগৎ পসারে হাত'। দারুব্রহ্মের এই অভিনব রূপ গ্রহণ করে সকলকে তিনি যেন আহ্বান করলেন— রূপ নয়, অরূপের সন্ধান কর। সেখানে কোনো সংকীর্ণতা নেই, মালিন্য নেই, গণ্ডীহীন এক বিশাল ভাবসমুদ্র। দারুমূর্তির দুটি হাত প্রসারিত করে তিনি যেন সকলকে বলছেন— 'এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার। এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।' তাইতো আমরা দেখলাম, শবর থেকে ব্রাহ্মণ, রাজা থেকে কুটিরবাসী, সাধক থেকে পাতক; সকল পথের যাত্রী— জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত সবাই মিলে সেই অরূপের ভাব সাগরে অবগাহন করে ধন্য হলেন, সার্থক হলো জীবন। এমনই অদ্ভুত প্রভু জগন্নাথদেবের রূপ-লীলা। ধন্য মানবজাতি। তাইতো তাঁর পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা— 'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে। □

একটি কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান অম্বুবাচী

ড. সর্বাণী চক্রবর্তী

অম্বুবাচী একটি সুপ্রাচীন বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠা কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। এই শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হলো বর্ষণ সূচনাকারক তিথি বা সময়। কোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে 'জলবর্ষণ' সূচনা করায় বা বিজ্ঞাপিত করায় যে— 'অম্বু তদ্বর্ষণং বাচয়তি সূচয়তি ইতি— অম্বুবাচী।' 'অবি' শব্দের সঙ্গে কর্তৃবাচ্যে 'উন্' প্রত্যয় যোগ হয়ে 'অম্বু' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'অবি' শব্দের অর্থ ঋতুমতী আর 'উন্' প্রত্যয়ের ব্যবহার হলো 'হয় যে' অর্থে। তাই অম্বু শব্দের অর্থ হলো 'ঋতুমতী' হয় যে। 'বাচী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো [বচ্ +ণিচ্+অণ্ (উপপদ তৎপুরুষ সমাস) ঙীপ্] সূচনা করায় যে। তাহলে এর সম্পূর্ণ অর্থ হলো পৃথিবীর ঋতুমতীভাব সুচনা করায় বা বুঝিয়ে দেয় যে তিথি বা সময়। তারই নাম অম্বুবাচী।

ষড়বেদাঙ্গের অন্যতম জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেদিন বা যে সময় সূর্য মিথুন রাশিতে গমন করে, সে সময়কে বলে অম্বুবাচী। —'যস্মিন্ বারে সহস্রাংশুর্যৎকালে মিথুনং ব্রজেৎ। অম্বুবাচী ভবেন্নিত্যং পুনস্ত্যকালবারয়োঃ।।'

কৃত্যতত্ত্বেও বলা হয়েছে, যে সময়ে সূর্য মিথুন রাশিতে গমন করে সে সময়ের মধ্যে তিনদিন কুড়িদণ্ড সময়কে বলা হয় অম্বুবাচী। —'যদ্বারে যৎকালে মিথুনসংক্রমণং ভূতং তদ্ বারাভ্য, তাবৎ কালাবধি বিংশত্যাদিদণ্ডাধিকদিনত্রয় অম্বুবাচী।' আষাঢ় মাসে সূর্য মিথুনরাশিতে অবস্থান করে। মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষার্ধ, আর্দ্রা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ এবং পুনর্বসু নক্ষত্রের প্রধান তিন চতুর্থাংশ মোট সোয়া দুই নক্ষত্র মিথুন রাশির অন্তর্ভুক্ত মৎস্যসূক্তে বলা হয়েছে, সূর্য যখন মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগ শেষ করে আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম এক চতুর্থাংশ ভোগ করতে থাকে তখন পৃথিবী ঋতুমতী হয়— 'মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্র পাদোহম্বুবাচী। ঋতুমতী স্খলু পৃথ্বী...।'

এ সময়ে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, অধ্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ। সর্পভয় নিবারণের জন্য দুধ পান করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন— 'তত্রাধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্যম্। সর্পভয়োপশমনায় দুগ্ধং পেয়ম্।' মৎস্যসূক্তের ৫৮ পটলে বলা হয়েছে সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম অংশে অবস্থানকালে পৃথিবী রজঃস্বলা

হয়। তাই সেদিন থেকে তিনদিন পর্যন্ত বীজবপন করা উচিত নয়।

‘রবৌ রুদ্রাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ
সংজায়তে রজঃ।
তস্মাৎ দিনত্রয়ং যাবৎ বীজবাপং
পরিত্যজেৎ।’

মহাতন্ত্রেও এ প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেখানে দেবাদিদেব মহেশ্বর পার্বতীকে বলছেন যে— হে, শঙ্করি, সূর্য মিথুন রাশিতে অবস্থানকালে যখন আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রাপ্ত হয় সেই তিনদিন যজ্ঞাদি ত্যাগ করা উচিত। পৃথিবী ঋতুমতী থাকাকালে পূর্ব-সংকল্পিত না হলে কাম্য-কর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, তীর্থযাত্রাদিও করা উচিত নয়। ভূমিখনন বা বীজবপন তো করা যাবেই না, এমনকী মাটিতে সূঁচ ফোটানোও উচিত নয়।

প্রকৃতির ঋতুচক্রে তৃতীয় মাস হলো আষাঢ় মাস। এই মাসের প্রথম দিনেই অপূর্ব চিকনকালো মেঘমালা দেখে মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত ‘মেঘদূত’ কাব্যে লিখেছেন—

‘আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে
মেঘমশ্লিষ্টসানুং
বপ্রকীড়া পরিণতগজং প্রেক্ষণায়ং
দদর্শ।’

পৃথিবী হলো শস্য উৎপাদনকারিণী ও প্রজনন শক্তির প্রতীক। তাই প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবী পূজিতা হয়ে আসছে। শ্রুত যে, প্রাক্-আর্য মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার খনন কার্যের ফলে যেসকল পাথরের তৈরি স্ত্রীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে একটি মূর্তির ক্রোড়ে একটি গাছ রয়েছে। এ দেখে সহজেই অনুমেয় হয় নাকি যে এটি মাতৃরূপিণী পৃথিবীর মূর্তি। পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা শুধু ভারতেই নয়, অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। যেমন— প্রাচীন জার্মানদের দেবী হলেন নেথসি মাতৃরূপিণী পৃথিবী। এছাড়া প্রাচীন গ্রিকদের রহী, রোমানদের সিবিলি দেবী মাতৃরূপিণী পৃথিবী বলে স্বীকৃতা।

আবার বৈদিকসাহিত্যে আমরা দেখতে পাই সেখানে পৃথিবীকে মাতৃরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দেখা যায় বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে ‘মাতা’ ও আকাশকে ‘পিতা’ বলে স্তুতি করেছেন এই বলে— ‘দ্যৌ পিতা মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।’ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়— বর্ষা হলো দ্যৌরূপ, পিতাররেতঃ। দ্যৌরূপী পিতার বর্ষা রেতঃ সিঞ্চনের দ্বারাই মাতা পৃথিবী তাঁর গর্ভে ধারণ করেন সর্ব প্রকারের শস্য। ‘এহো বাহ্য’, বৈদিক ঋষি ঋগ্বেদের ১২।১।৯ মন্ত্রে নিজেকেও পৃথিবীর পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন— ‘মাতাভূমি পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ।’ এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত ‘শ্রীদুর্গা’ গ্রন্থের ১৬৫ পৃ. পাদটীকার কিছু অংশ উল্লেখ করা যাক— ‘প্রকৃতির বা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে এরকম যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অম্বুবাচীর অর্থ করেন, বৃষ্টির প্রথম ধারা পৃথিবীতে যখন পড়ে তখন কল্পনা করতে হবে ধরিত্রীমাতা ঋতুমতী হয়েছেন।’ অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে বাস্তবধারণা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মানুষের তা না হলে পৃথিবীকে দেবী জ্ঞান করে ঋতুমতী ভাবতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সময় অনেক কিছু নিষেধ করা হয়েছে। যেমন— বীজবপন করা, রান্নাকরা, বেদাধ্যয়ন, গমনাগমন, কাম্য ও নৈমিত্তিককর্ম, আহারাদি।

বর্ষাবরণ উৎসবকে কেন্দ্র করেই অনেক কিছু আমরা করে থাকি। বর্ষা না হলে পৃথিবীর মাটি ভিজবে না, আবার মাটি না ভিজলে শস্যবীজ বপন করা সম্ভব হবে না। জমি উর্বর না হলেও শস্য ফলন ভালো হবে না। স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখিত অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক, পাখি ও রাজাদের যুদ্ধযাত্রা-শস্যহানিকর— এ ছ'টি উপদ্রবের মধ্যে অতিবৃষ্টি একটি। তাই অতিবৃষ্টির সময় বীজবপন করলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের দাবদাহের পর পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রথম বৃষ্টির জল পড়লে মাটি অনেকটা শুষে নেয় এবং অভ্যন্তরের উত্তাপের ফলে বাষ্পের আকারে তা বের হতে থাকে। সেই সময়ে হাল চাষ করলে কিংবা মাটি খনন করলে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প বের হয়ে যায়। এই বাষ্প স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেজন্য মাটি খনন করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই সময়ে গুরুগৃহে শিষ্যরা অধ্যয়ন বন্ধ করে গুরুর কৃষিক্ষেত্রে জল ধরে রাখার জন্য জমির আল বাঁধার কাজে গুরুকে সাহায্য করতেন এবং সেটিই ছিল বিদ্যার্থীদের প্রধান কাজ। সেজন্য এই সময়ে অধ্যয়ন বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাভারতে উদ্দালক ও আরুণির কাহিনি সকলেরই জানা আছে। পরবর্তীকালে গুরুর আশীর্বাদেই আরুণি সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন।

এই সময় দূরে ভ্রমণ বা সাতদিন যাত্রা নিষেধ করা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের পর বৃষ্টির জল মাথায় লাগলে শরীর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেজন্য শাস্ত্রে এই বিধান দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদে আছে— অকারণে একপ্রহর বৃষ্টিতে ভিজলে পাপ হয় এবং একদিন উপবাস করে তার প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বিধান আছে— ‘রোগাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যম্’।

প্রথম বৃষ্টিতে ধরিত্রী শীতল হলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তখন বীজবপন করলে ভালো ফসল উৎপাদন হবে বলেই প্রথম বৃষ্টির পর অম্বুবাচীর তিনদিন সময়টাকে পৃথিবীর ঋতুমতীকাল বলা হয়েছে। তাই এইসময় বীজবপন করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মাতৃস্বরূপা পৃথিবীতে এই রজঃস্বলারূপ অশুচিভাব আরোপ করে শাস্ত্রকাররা সর্বপ্রকারে সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধনের বিধান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে

‘সংবৎসর প্রদীপ’ গ্রন্থে বিষ্ণুরহস্য অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে— ‘যতী (সংযমী ব্রহ্মচারী), ব্রতী (ব্রতধারী ব্রহ্মচারী), বিধবা এবং ব্রাহ্মণ অম্বুবাচীর দিনে রান্না করা আহার করবেন না। ‘যতিনো ব্রতিনচৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা। অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ।’ —শ্লোকটির যথার্থ অর্থ বুঝতে না পেরে ‘পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ’ কথাটির অর্থ অনেকে মনে করেন নিজে রান্না করে খাওয়া নিষেধ। কিন্তু অন্য কেউ রান্না করে দিলে আহার করা যেতে পারে। শাস্ত্রকারগণ কিন্তু এ প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলেছেন— নিজে বা অন্যের রান্না করা অন্ন ভক্ষণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। ‘সংবৎসর প্রদীপঃ’ গ্রন্থে বলছেন— ‘স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা/ভক্ষণং নৈব কর্তব্যম্...।।’

মনে রাখতে হবে— ব্রতীদের ক্ষেত্রে কেন আহারাদির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য মানুষের মধ্যে অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। এরফলে সাময়িকভাবে হজমশক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কথায় বলে— ‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।’ —ধর্মসাধনার প্রথম উপকরণ শরীরকে সুস্থ রাখার জল, ফল মূল ও দুধ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এখানেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এই বিধান সমাজের সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রচলিত নয় কেন? এর উত্তরে বলা যায়— ব্রহ্মচর্য যাঁরা পালন করেন তাঁদের আসব, অরিষ্ট জাতীয় ওষুধ সেবন নিষিদ্ধ তাই তাঁদের স্বাভাবিক আহারের পরিবর্তনের দ্বারাই শরীর সুস্থ রাখতে হয়। সেজন্যই একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস অথবা খাদ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

রামায়ণে ‘সীতা’কে পৃথিবীর কন্যা বলে ধরা হয়েছে। অনেকে তাই সীতাকে কৃষিসভ্যতার প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন। বৈদিকযুগে ‘দ্যাবাপৃথিবী শব্দটির উল্লেখ আছে। অম্বুবাচীর সময় মহদ্‌যোনি পৃথিবীর পরম মাতৃত্বকে স্মরণ করার জন্যই এ অনুষ্ঠান প্রতি বছর হয়ে আসছে। যতি, ব্রতী, বিধবা ও ব্রাহ্মণরা পৃথিবীর প্রজনন শক্তিকে স্মরণ করে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন। শাস্ত্রকাররা বিধাবাদেরও ব্রহ্মচারীর পর্যায়ে ফেলেছেন। ‘বিষ্ণুসংহিতা’য় বলা হয়েছে— স্বামী মারা গেলে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত। —‘মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং পালনীয়ম্।’ আবার আমরা ‘মনুসংহিতা’য় দেখি— স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচারিণীর মতো অবস্থান করবেন। —‘মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।’ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৩তম অধ্যায়ে বিধবাদের নিয়ম পালনের একটি সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে— বিধবারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নারায়ণের সেবাব্রত নিয়ে নারায়ণের নাম স্মরণ করে দিনান্তে একবার মাত্র হবিষান্ন গ্রহণ করে দিন যাপন করবে— ‘একভক্তা দিনান্তে সা হবিষান্নরতা সদা।’ সেজন্যই ব্রহ্মচর্য ব্রতধারিণী বিধবারাও প্রজননশক্তির আধারভূতা ধরিত্রীকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে নিজেরা সংযত জীবনযাপন করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বাসই ধর্মের প্রাণ। আর এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। একসময়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরকে পার্বতী জিজ্ঞাসা করেন জীবনের শেষ পারানির কড়ি কী? তদুত্তরে মহাদেব বলেন— ‘বিশ্বাস’। এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের নানান রুচি, আচার ইত্যাদি। শিবমহিম্নস্তোত্রের প্রণেতা পুষ্পদন্ত তাঁর স্তোত্রের একস্থানে বলেছেন— মানুষ নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল ও বক্র নানা পথই অবলম্বন করে থাকেন।

হিন্দু সমাজে এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সরল মনের বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যায় কি? এই বিশ্বাসই নানা ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপুষ্ট করে এবং তার পথ চলতে সাহায্য করে। মহাভারতকার বলছেন— ‘ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।’ অর্থাৎ ধর্ম নষ্ট হলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম তাকে রক্ষা করে। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদের সেই অমোঘ বাণী— ‘ধর্মং চর’। ধর্মের প্রাথমিক প্ল্যাটফর্মই হলো ধর্মাচরণ।

ওড়িশার মানুষেরা এই উৎসবকে বলেন রজঃ। সেখানে এই উৎসব খুব বড়ো করে হয়। তবে সেখানে এর অনুষ্ঠানকাল হলো জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি থেকে ২রা আষাঢ় পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পাশে যে বিমলাদেবীর মন্দির আছে সেখানে তিনদিন বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। আগে বলেছি ওড়িশায় এই উৎসবকে বলা হয় ‘রজঃ’। এর একটি অর্থ হলো ধূলি, অন্যটি হলো স্ত্রীলোকের ঋতুচক্র। স্ত্রীজাতি রজঃস্বলা হওয়ার পর যেমন সন্তান ধারণের ক্ষমতা জন্মায়, ঠিক তেমনি আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতে পৃথিবীর ধূলি মৃত্তিকা কণায় প্রশমিত হয়ে মাতৃরূপিণী পৃথিবীকে শস্যাদি উৎপাদনের উপযুক্ত করে। অম্বুবাচীতে কামাখ্যা মন্দিরে এক বিরাট উৎসব হয়। এটি অত্যন্ত পবিত্র পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেবীর যোনি এই স্থানে পতিত হয়। সেজন্য এই তীর্থও হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র মহাপীঠ। এটি শক্তিপীঠ নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র :

১. ভারতকোষ—(১ম খণ্ড) সুশীল কুমার দে ব.সা.প.।

২. বিশ্বকোষ—(১ম খণ্ড) নীহাররঞ্জন রায় (১৯৭৭)।

৩. উদ্বোধন---১৩৯৬, হরিপদ আচার্য—(অম্বুবাচী)।

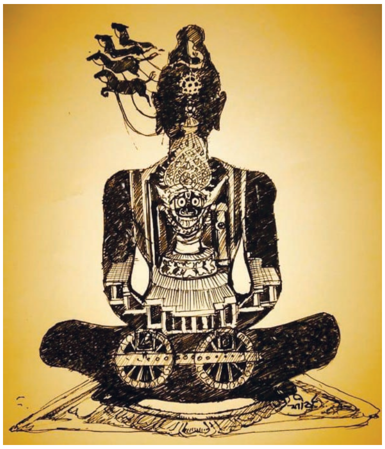

চিরায়ত যাত্রায় ভগবান ভক্তদেরও পথে নামিয়েছেন

কল্যাণ গৌতম

আষাঢ়মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে ভ্রাতা-ভগিনীর ত্রয়ীরূপ ধারণ করে শ্রীভগবানের যাত্রা। জগন্নাথদেবের মূল মন্দির ছেড়ে প্রায় তিন কিলোমিটার রাজকীয় পথ পরিক্রমা করে তাঁরা মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছান। সেখানে আটদিন তাঁদের পুণ্য অবস্থান ঘটে। তারপর সকলে ফিরে আসেন আপন মন্দিরে। গমন ও প্রত্যাগমনের এই চিরায়ত যাত্রায় ভগবান আমাদেরও যেন পথে নামিয়েছেন। সেই ঐশীপথ চেনার নামই রথযাত্রা মহোৎসব। রথ যে দেহরূপ মন্দিরও বটে! দেহের খাঁচায় ঈশ্বরকে অধিষ্ঠান করিয়েই জীবনের চিরন্তন শুভযাত্রা। দেহে যেমন ২০৬টি অস্থি, শ্রীজগন্নাথদেবের রথও ২০৬টি অস্থিরূপ কাষ্ঠে নির্মিত। কোথায় যেন রূপ আর অরূপ মিলেমিশে একাকার!

জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথের নাম যথাক্রমে নন্দীঘোষ বা কপিধ্বজ, তালধ্বজ বা হলধ্বজ এবং দর্পদলন বা পদ্মধ্বজ। রথ তিনটির চাকার সংখ্যা যথাক্রমে ১৬, ১৪ ও ১২; সব মিলিয়ে সমগ্র রথযাত্রার ৪২টি চাকার সমাহার। এই তিন রথের রশি বা দড়ি হচ্ছে তিনটি সাপ; তা যথাক্রমে শঙ্খচূড়, বাসুকি ও স্বর্ণচূড়।

সব ক'টি রথই কাষ্ঠ নির্মিত, যেন ভক্তিরূপ কাষ্ঠ। এবং এই রথ পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশিষ্ট শব্দের উৎপত্তি ঘটে, যাকে 'বেদ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রথযাত্রা সংঘটিত হবার পথে চাকার তিনটি চিহ্ন বা দাগ ভূমিতে পতিত হয়; যাকে গঙ্গা-যমুনা- সরস্বতী— এই তিন নদীর চিহ্নরূপে অভিহিত করা হয়। রথযাত্রা এগিয়ে যাবার পর পরেই ভক্তবৃন্দ এই ত্রিদাগের পুণ্যধূলি গ্রহণ করেন, কেউ-বা দাগের চিহ্নে আপন দেহ সমর্পণ করে নিজে গাত্রে মেখে নেন পরম ধূলি। হিন্দু বিশ্বাস, ভূপতিত হয়ে ধূলি মাখার সৌকর্য তিন নদীর সঙ্গমে পুণ্যস্নানের ফললাভের সমতুল্য।

তিন ভাই-বোনের মধ্যে বলভদ্র জ্যেষ্ঠ, তাই প্রথমে বলভদ্রের তালধ্বজ রথ এগিয়ে চলে। বলরামের এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে গুরুতত্ত্বের বহু প্রাচীন আভাস। বলভদ্র গুরুতত্ত্বের প্রতীক, তিনিই যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ। মানবজীবনে গুরুকৃপা সর্বোপরি থাকতে হবে। গুরুতত্ত্বে যে ১৪ ভুবনের ধারণা আছে, তা তো বলভদ্রের তালধ্বজ রথের ১৪টি চাকারূপ চিহ্ন-সংকেতই। জগন্নাথের রথে রয়েছে ১৬টি চাকা, যা দশটি ইন্দ্রিয় এবং ছ'টি রিপূর যোগফলের প্রতীক সংখ্যা। ভগবান সকল ১৬-কে পদতলে বা নীচে রেখেছেন; কিংবা বলা চলে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সুভদ্রার রথে স্থিত ১২টি চাকা ভক্তির বারোমাস্যার চিহ্নিত সংখ্যা। বারোমাস অর্থাৎ রোজই ধর্ম যাপন করতে হবে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তির পুণ্য অর্ঘ্য সাজিয়ে।

মধ্যে অবস্থান করে সুভদ্রার পদ্মধ্বজ রথ। ভক্তিতত্ত্বের মূর্তিপ্রতিমা সুভদ্রার মধ্যেই খুঁজে পান ভক্তমণ্ডলী। সুভদ্রা যে ভক্তির অনন্ত বিগ্রহ; শুদ্ধাভক্তি যেন মুর্তিমতি হয়ে পরিক্রমায় চলেছেন। সর্বশেষে চলেছেন শ্রীজগন্নাথ অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং। যেন গুরু, ভক্ত এবং ভগবানের সমন্বিত ক্রমিক যাত্রা চলছে আবহমানকাল ধরে। এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সমস্ত দেবতা। তিনটি রথেই সকল দেব-দেবীর অবস্থান। রথের রশি ছোঁওয়ামাত্র গুরু, পরম গুরু, পরমাধ্য গুরু; ভগবান এবং সকল দেব-দেবীর চরণ স্পর্শ সুসম্পন্ন হবে। হিন্দু বিশ্বাস, এর ফলে মানুষের পুনর্জন্মলাভ হয়ে জাগতিক দুঃখকষ্ট আর পেতে হবে না, সরাসরি ঈশ্বরের পাদপদ্মলাভ সম্পন্ন হবে। রথের রশি স্পর্শ করে টানলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমতুল্য ফললাভ ঘটবে বলেও বিশ্বাস।

ভক্তজনের বিশ্বাস, এই যে রথ এগিয়ে চলে, তা প্রভুর ইচ্ছাশক্তিতেই ঘটে, কারণ পথ চলতে চলতে রথ থেমে যায়, আবার চলে, আবারও থেমে যায়। এই যে চলা, না-চলার চিরায়ত যাত্রা, এর তাৎপর্য কী? ভক্ত ভগবানের পথ চলা দেখছেন, ভগবানও কী দেখছেন! ভগবান খোঁজেন তাঁর প্রিয় ভক্তকে অসংখ্য নর-নারীর ভিড়ে; হয়তো নিজেকেও খোঁজেন। রাধাভাবে বিভোর হয়ে শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ নৃত্য করতে করতে প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করছেন আর এগিয়ে চলেছেন। প্রভুরও যেন শ্রীচৈতন্যের প্রতি খেয়াল, লক্ষ লক্ষ ভক্তের মাঝে প্রিয় ভক্তের মুখও যেন তাঁর দেখা চাই, খুঁজে পাওয়া চাই। তাইতো তিনি থামেন, তাই তো ভক্তের মুখদর্শন করেন, আবার এগিয়ে যান। ভক্ত না থাকলে ভগবানই-বা কী নিয়ে থাকবেন!

'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

(তথ্যসূত্র : সমাজ মাধ্যমের নানান ভাষ্যে সম্প্রসারিত তথ্য)

আমেরিকাতে শ্রীলপ্রভুপাদের উদ্যোগে রথযাত্রা।

রথযাত্রার বিশ্বায়ন

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

বহু বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ক্ষেত্রের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, উত্তর ভারত, মধ্য ভারত, পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য অনুসারী এবং দেবী মারিয়াম্মানের পূজারিদের মধ্যে রথযাত্রার বহুল প্রচলন দেখা যায়। এছাড়াও, বৌদ্ধ মতাবলম্বী ও তীর্থঙ্করের অনুসারী জৈন ভক্তদের মধ্যে রথযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। পুরাণ ও শাস্ত্র অনুসারে, শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম। দ্বাপর যুগ অতিবাহিত হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীক্ষেত্রে প্রভু শ্রীজগন্নাথস্বামী রূপে আবির্ভূত এবং তাঁর দারুব্রহ্ম মূর্তিতে পূজিত। তাঁর সঙ্গে পূজিত তাঁর অগ্রজ শ্রীবলভদ্র ও দেবী সুভদ্রা।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি ওই-যে বাহির পথে।।

১৯৪৭ সালে বিভাজিত হয়েছে ভারত। অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সাতুড়িয়া উপজেলায় ধামরাই রথযাত্রা হলো অন্যতম বিখ্যাত, জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। আনুমানিক ১০৭৯ বঙ্গাব্দে (১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে) হয় এই রথযাত্রার সূত্রপাত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার এই রথ বাঁশ দিয়ে নির্মিত হতো। পরে কাঠ দিয়ে এই রথ নির্মাণ শুরু হয়। প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন এই রথযাত্রার ব্যয়ভার প্রথম দিকে সাতুড়িয়া উপজেলার বালিয়াটির জমিদাররাই বহন করতেন। ধামরাই, কালিয়াকৈর, সাতুড়িয়া ও সিঙ্গাইরের কাষ্ঠশিল্পীরা তৈরি করে থাকেন এই রথ। ১৯৩৩ সালে নির্মিত তিন-তলা বিশিষ্ট নতুন রথটির উচ্চতা ৬০ ফুট। রথটি ৪৫ ফুট চওড়া। রথের প্রথম ও দ্বিতীয় তলের চারটি কোণ চারটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। তৃতীয় তলটি একটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। রথের এই প্রকোষ্ঠগুলি 'নবরত্ন' নামে পরিচিত। রথটি ৩২টি বৃহদাকার চাকা যুক্ত এবং দুটি কাঠের অশ্ব দ্বারা বাহিত। এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের পাটের রশি এই রথের সঙ্গে যুক্ত করে টানা হয় এই রথ।

১৯৫০ পরবর্তী পর্যায়ে জমিদারি প্রথার অবসান হলে টাঙ্গাইল, মির্জাপুর নিবাসী প্রথিতযশা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রণদা প্রসাদ সাহা রথযাত্রা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেন সবরকম সাহায্যের হাত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সংগঠিত ও অনুষ্ঠিত হয় এই রথযাত্রা। ১৯৭১ সালে রথটিকে পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের সেই নৃশংস এথনিক ক্লিনজিং চলাকালীন রথযাত্রার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর.পি. সাহাকে অপহরণ ও নির্মম ভাবে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাঁশ দিয়ে একটি অস্থায়ী রথ নির্মিত হয়। প্রাচীন রথযাত্রার ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষায় এগিয়ে আসেন আর.পি. সাহার কন্যা জয়া পতি, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, গৌর গোপাল সাহা ও ঠাকুর গোপাল বণিক।

২০০৬ সালে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রি একটি নতুন রথ নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্যদানের প্রস্তাবনা উপস্থাপিত করেন।

সেই অনুযায়ী, ২০১০ সালে তিনটি তলা বিশিষ্ট একটি নতুন রথ নির্মিত হয়। নতুন রথটি ৪৫ ফুট প্রশস্ত। রথটির উচ্চতা ২৭ ফুট। রথটি ১৫টি চাকা যুক্ত। রথটিতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বিদ্যমান। মাধব বাড়ি মন্দির থেকে প্রতি বছর এই রথ গোপনগর মন্দির পর্যন্ত আসে। ভক্তদের হাতে হাতে রথের রশিতে পড়ে টান। ঘুরতে থাকে চাকা, চলতে থাকে রথ। সাত দিন পরে উলটো রথে জগন্নাথ ফিরে আসেন মাধব বাড়ি।

বাংলা পঞ্জিকা ও নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ধামরাইতে উদ্‌যাপিত হয় এই রথযাত্রা। রথযাত্রার অনুষঙ্গ হিসেবে আষাঢ় মাস জুড়ে ধামরাইতে চলে রথের মেলা ও উৎসব। বাংলাদেশের জনপ্রিয় পার্বণগুলির মধ্যে ধামরাইয়ের এই রথের মেলা অন্যতম। এই রথের মেলার আকর্ষণ হলো পুতুল নাচ ও সার্কাস। এছাড়াও মেলায় বিভিন্ন দোকানে হরেক রকম জিনিসপত্র বেচাকেনা চলে। বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের মিলনস্থল হয়ে ওঠে ধামরাইয়ের এই রথের মেলা।

সানফ্রান্সিসকোতে ইসকনের রথযাত্রা

বাজলো তূর্য আকাশ পথে
সূর্য আসেন অগ্নি রথে।।

আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে চীনা পর্যটক ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়েন ভারত জুড়ে রথযাত্রা উদ্‌যাপনের বিবরণ নথিবদ্ধ করেছিলেন। ভারত ভ্রমণ ও পরিদর্শনে আসা ইওরোপীয় পাদরি ও পর্যটকরা পুরীধামে প্রভু শ্রীজগন্নাথের রথ দেখে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। তাঁরা ইংরাজিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নামকরণ করেছেন— 'Juggernaut'। ইংরাজিতে এর অর্থ একাধিক চক্রবিশিষ্ট যান যা দুর্দমনীয়, অপ্রতিরোধ্য। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, প্রায় ১৮০০ সাল নাগাদ রেভারেন্ড ক্লডিয়াস বুকানন তাঁর লেখা— 'ক্রিশ্চিয়ান রিসার্চেস ইন এশিয়া' বইতে এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। ১৮৭৮ সালে হার্পারের লেখা 'Juggernaut' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীজগন্নাথ এবং পুরীধামের রথযাত্রার বিষয়টি আলোচিত হয়। এর অনেক আগে ত্রয়োদশ শতকে ইওরোপীয় খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ফ্রান্সিসকান যাজক ও পাদরিদের লেখা বিবরণে পাওয়া যায় ভারতীয় রথযাত্রার উল্লেখ। চতুর্দশ শতকে ইওরোপ থেকে ইসলামিক দেশগুলি-সহ ভারত ও চীনে ভ্রমণরত পর্যটক জন ম্যান্ডেভিলের লেখা 'ট্রাভেলস্ অফ জন ম্যান্ডেভিল' বইতে বর্ণিত হয়েছে ভারতীয় রথযাত্রা উৎসবের আখ্যান।

সাম্প্রতিক অতীতে, মেরি শেলির লেখা 'দ্য লাস্ট ম্যান' উপন্যাসে, চার্লস ডিকেন্স, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, এইচ.জি. ওয়েলস, হেনরি লংফেলো, জো ক্লেইন, বিল উইলসন ও জন শার্লির লেখায় 'Juggernaut' শব্দটি নানা প্রসঙ্গে, নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে আমেরিকায় প্রকাশিত মার্ভেল কমিক্সের এক্স মেন সিরিজে স্ট্যান লি ও জ্যাক কার্বির সৃষ্ট একটি অতিমানবীয় চরিত্র হলো— 'Juggernaut' বা কেইন মার্কো।

পথ ভাবে আমি দেব
রথ ভাবে আমি।।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার স্বামীবাগে 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস' (ইসকন) বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের একটি মন্দির রয়েছে। ইসকন হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও পরম্পরার অনুসারী আন্তর্জাতিক স্তরের একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত এই মহতী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে প্রতি বছর ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রা। ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত এই রথযাত্রায় অসংখ্য মানুষ যোগদান করেন এবং এই রথযাত্রা হলো বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি অন্যতম বড়ো উৎসব। অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে প্রতিষ্ঠা করেন— আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ। ১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই দিনটিতে সমুদ্রপারে বিদেশের মাটিতে সানফ্রান্সিসকোয় রথযাত্রা সংগঠিত করলেন শ্রীপ্রভুপাদ। এরপর ইসকনের ভক্তিভাবে, উদ্যোগে ও পরিশ্রমে ধীরে ধীরে জগৎপতি শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা ছড়িয়ে পড়লো লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, ডারবান, ক্যানবেরা, সিডনি, বার্লিন, মস্কো, টরন্টো, টোকিয়ো ও রোমের মতো শহরে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাবের অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন— 'জগতে আছে যত নগর ও গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম'। গৌড়ীয় পরম্পরার অনুসারী এই ধর্মীয় সংগঠন এবং এই সংগঠনে সমর্পিত অগণিত ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও ভক্তের অক্লান্ত সেবায়, পরিশ্রমে, আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনে পৃথিবী জুড়ে মহাপ্রভুর সেই সংকল্প আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী
ভবতু মে।।

নারদ পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, মা লক্ষ্মীকে ভগবান নারায়ণ বলেন— যে ব্যক্তি রথারোহী শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা— এই দেবত্রয়ীকে দর্শন করবেন, তাঁর জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে চিরমুক্তি ঘটবে। তিনি বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠে স্থান পাবেন। শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তদের এই চিরন্তন আস্থা ও বিশ্বাসের এক অসামান্য, অনবদ্য প্রতিফলন হলো এই রথযাত্রা। কালের নিয়মে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিতপ্রাণ ভক্তরা বর্তমানে গোটা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছেন। স্মরণাতীত কাল থেকেই পুরীধামে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। প্রাচীন এই উৎসব আজ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ইসকনের উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় আজ ইওরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে রথযাত্রা। রাশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে রথযাত্রা আজ এক জনপ্রিয় উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসকন বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলেছে রথযাত্রার পৌরাণিক তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পবিত্র, আনন্দময় ও শান্তিময় পরশ পেয়েছেন প্রবাসী ভারতীয় সমেত সেই দেশগুলির স্থানীয়রাও। সব বাধাবিঘ্ন জয় করে সকলের সহযোগিতা ও সাহচর্যে ইসকন ও অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় রথ একবিংশ শতাব্দীতেপৃথিবী জুড়ে নিশ্চিতভাবে গতিপ্রাপ্ত হবে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদে, কৃপায় ও অপার লীলায় একবিংশ শতাব্দী হয়ে উঠবে ভারতের শতাব্দী। □

অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা আমরা কেউ ভুলে যাইনি। অষ্টাদশ শতকের একদম গোড়ার কথা। মুম্বই চলচ্চিত্রের জনক ধুণ্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে তখনও দাদাসাহেব ফালকে হয়ে ওঠেননি, নির্মাণ করে ওঠেননি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নামের ছবিটি। তার অন্তত বছর আটেক আগে ১৯০৫ সাল নাগাদ এক শীর্ণকায় তরুণ বাঙ্গালি, রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি বানিয়ে বাংলা সংবাদ চিত্র, বারোটি তথ্যচিত্র, তিনটি বিজ্ঞাপন চিত্র বানিয়ে রীতিমতো সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হীরালাল সেন। এই দেশে ছবি নিয়ে যদি কিছু বলতে হয়, তবে অবশ্যই হীরালাল সেনের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে তবে কথা বলা উচিত। কারণ তিনিই এই দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃত।

এরপর থেকে কত নামি অনামি পরিচালকের হাতে নির্মিত ছবি আজও দেখার জন্য অধিকাংশ বাঙ্গালি উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। অনেকেই জানেন না, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'র আগেও 'বাবলা' বলে একটি ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিল। বাংলা ছবির গুণগত বিচার কেবল সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল দিয়ে করলে ভুল হবে। দেবকী বসু, বিজয় বসু, হিমাংশু রায় বা অনাদি বসুর রমরমিয়ে চলা রং তামাসার ব্যবসা, ম্যাজিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির পথে হেঁটেই কালক্রমে শুরু হয় অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। যার হাত ধরেই সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল ও অন্যান্যেরা তৈরি করেছিলেন একের পর এক কালজয়ী সব ছবি। অগ্রদূত, অগ্রগামী নাম দিয়ে নাম না জানা পরিচালকদের নির্মিত ছবি দেখতে এ প্রজন্মের মানুষও রাতের পর রাত জাগে। প্রতিটি ছবির এখনও অসম্ভব জনপ্রিয়তা।

বাংলা ছবির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে যদি সামনের দিকে তাকাই তবে কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাম জমানা থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া একষট্টি বাষট্টি হাজার শিল্প কারখানার পাশাপাশি কয়েক লক্ষ শিল্পী কলাকুশলীর মেধা ও শ্রমে গড়ে ওঠা বিশাল টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। শহর গ্রামের হাজার হাজার সিনেমা হল বন্ধ হয়ে এর জায়গা নিয়েছে শহরের মাল্টিপ্লেক্স। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত মানুষদের বিনোদনে আয়ত্তের বাইরে এইসব মাল্টিপ্লেক্স। এছাড়া গোদের ওপর ফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দাদাদের গুন্ডাগিরি। অনুপ্রেরণায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ আর পাঁচটা বিষয়ের মতো চলচ্চিত্র প্রকাশেও অনুপ্রেরণার ছাড়পত্র না পেলে হলে প্রকাশ (রিলিজ) পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। ক্ষুদ্র ও নবাগত চলচ্চিত্র প্রযোজকদের সামনে এর ফলে অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই সব কিছুই শুনছিলাম বাংলা ছবির নবাগত অভিনেতা প্রযোজক রাজা দে-র সঙ্গে আলাপচারিতায়। দেখছিলাম সম্প্রতি প্রকাশিত 'অন্য রূপকথা' ছবি।

মা সিমলা ফিল্মসের 'অন্য রূপকথা' কৈশোরের বিশ্বাস ও ভালোবাসার গল্পের বুনট নিয়ে একটি প্রেমকথা। নবীন চিকিৎসক ডাঃ অনির্বাণ রায় ছাব্বিশ বছর পর ছোটোবেলার ফেলে যাওয়া নিজের গ্রাম ফকিরপুরে এসে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়লেন। খুঁজে পেলেন ছোটোবেলার বন্ধুদের, খেলার সঙ্গীদের, খুঁজে পেলেন তিন্নিকে। নিজের ঠাকুদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওই বাড়িতেই দেখা হলো তিন্নির সঙ্গে। সে যদিও তখন রূপকথা নামে পরিচিত। অনির্বাণ তিন্নিকে আবার ফিরে পেতে চায়। এদিকে পঞ্চায়েত নেতা অনন্তের লালসার আগুনের আঁচ লেগেছে তিন্নির জীবনে। ফকিরপুরের অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে অনন্ত। গ্রামে নানারকম জীবনে অনন্ত যেন এক মূর্তিমান অভিশাপ। এই সময়েই নিজের ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে অনির্বাণের ফকিরপুরে আসা।

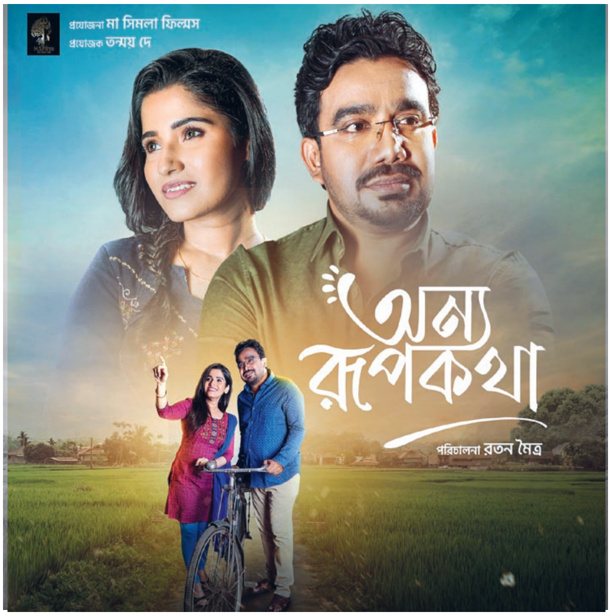

এরপর গল্প এগিয়েছে চেনা ছকে। অনির্বাণের বুদ্ধিমত্তায় গ্রামের মানুষ অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়, একদিন তিন্নি অর্থাৎ রূপকথা আবার ফিরে পায় তার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গীকে। মা সিমলা ফিল্মসের প্রযোজনায় সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'অন্য রূপকথা' ছবিটি কোভিড পরিস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার ফকিরপুর গ্রামেই শ্যুটিং হয়েছে। ছবির মূল আকর্ষণ অসামান্য গ্রামীণ পরিবেশ, ধানক্ষেত, নদী, আকাশ, খেলার মাঠ ও খেলাধুলায় মত্ত শিশুদের কলকাকলি। রয়েছে গ্রামীণ লোক সংস্কৃতি অপূর্ব সব চিত্র, সেবা ভারতীর কর্মকাণ্ডের কথাও উঠে এসেছে ছবির গল্পে। ফকিরপুরের তরুণ স্বয়ংসেবক রাজ দে'র নায়ক হিসেবে এই ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ। ঠাকুরদাদার চরিত্রে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, সুমিত সমাদ্দার খলনায়ক অনন্তের চরিত্রে এবং সুমন ব্যানার্জি, কৌশিক, অধিকারী পূজারিণী ঘোষ ছবিতে যথাযথ অভিনয় করেছেন। প্রিয়াঙ্কা দাসের আবহ এবং রূপঙ্করের সংগীত ছবিতে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। আমরা আশা রাখব রাজনৈতিক প্রতিকূলতা জয় করে বাংলা ছবি আবার আলোর মুখ দেখবে এবং আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব এই গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রযোজনায়।

গড়ের মাঠ

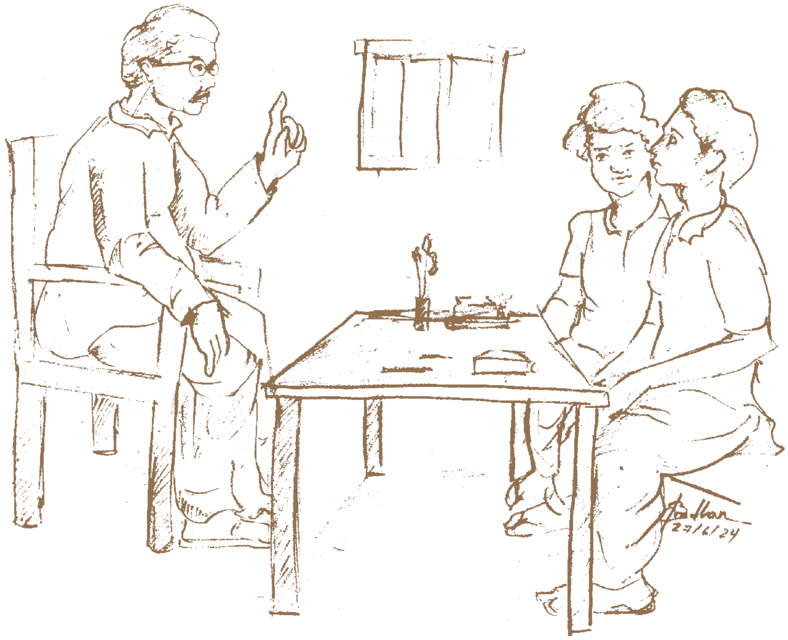

এক রবিবারের বিকেলে অধীর ও আনন্দ অমেয় জ্যাঠার ঘরে বসে গল্প করছিল। উত্তেজিত ভাবে আনন্দ বলছিল, 'কাল বিজয় আর সুনীলের সঙ্গে গড়ের মাঠে খেলতে গেছিলাম, কী বিশাল মাঠ, দেখে তাক লেগে যায়!' অধীর শান্তভাবে বন্ধুর কথা মন দিয়ে শুনছিল।

তখনই অমেয় জ্যাঠা ঘরে ঢুকলেন। হাতে এক কাপ চা। জানতে চাইলেন, কীসের গল্প চলছে। সব শোনার পর একটু অন্যমনস্ক হলেন। অধীর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, আপনার কি কোনো অঙ্কের কথা মাথায় এসেছে? জ্যাঠা একটু হাসলেন। বললেন, শুনবে? অধীর আর আনন্দ একসঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করল।

'আচ্ছা, তোমরা কার্টেশিয়ান প্লেন জানো তো?

'হ্যাঁ, জানি' বলল আনন্দ, 'একটি বড়ো গ্রাফ পেপারের মতো, যেখানে দুটি রেখা একটি অন্যটির মাঝখান অতিক্রম করে।'

'ঠিক', বললেন জ্যাঠা। ' একটি রেখা বাম ও ডান দিকে চলে। এটি হলো x অক্ষ এবং অন্যটি উপরে ও নীচে চলে। এটি হলো y অক্ষ। যেখানে রেখাগুলি অতিক্রম করে, যেটি মূলবিন্দু (origin) বলা হয়। এটিকে একটি মানচিত্রের মতো কল্পনা করতে পারো যেখানে তোমরা যে কোনো স্থানে পৌঁছাতে পারো, যতদূর বামে বা ডানে, উপরে বা নীচে যেতে পারো। উদাহরণস্বরূপ, (৩,২) মানে ৩ ধাপ ডানে আর দুই ধাপ উপরে। এটি আমাদের সমতল বিন্দু খুঁজে পেতে এবং চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। গড়ের মাঠ যেমন অনেক সময় অনন্ত মনে হয়, কার্টেশিয়ান প্লেন কিন্তু সত্যিই অনন্ত।'

অধীর ও আনন্দ একসঙ্গে মাথা নাড়লো।

'এবার বোঝো ল্যাটিস পয়েন্ট কী? একটি বিন্দু একটি কার্টেশিয়ান প্লেনের ল্যাটিস পয়েন্ট হয় যদি তার x অবস্থান এবং y অবস্থান উভয়ই পূর্ণ সংখ্যা হয়। উদাহরণস্বরূপ, (২,৩), (০, -১), এবং (-৪,৫) সবই ল্যাটিস পয়েন্ট, কারণ তাদের অবস্থান সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা। ল্যাটিস পয়েন্ট হলো সেই বিন্দু যেখানে গ্রাফ পেপারের গ্রিড লাইনগুলি একে অপরকে অতিক্রম করে, বুঝলে?'

'একদম', বলল আনন্দ।

'এবার অঙ্কটা বলি। কার্টেশিয়ান প্লেনে প্রতিটি বিন্দুতে (ল্যাটিস পয়েন্ট) একটি ধনাত্মক সংখ্যা (পজিটিভ ইন্টিজার) লেখা হয়েছে। প্রতিটি সংখ্যা তার চার পাশের চারটি সংখ্যার গড়। তাহলে কি বলতে পারো, দুটি বিন্দু সংখ্যার পার্থক্য কত হবে বা তাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ও কেন?'

আনন্দ ও অধীর দুজনেই কিছুক্ষণ ভাবার পর আনন্দ বলল, অঙ্কটা দেখতে কঠিন কিন্তু ততটা শক্ত নয়। আমি যেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, সব ল্যাটিস পয়েন্টে একই নম্বর লিখে দিই, তাহলে অঙ্কের শর্ত পূরণ হবে এবং যেকোনো দুটি ল্যাটিস পয়েন্টের উপর লেখা দুই সংখ্যার পার্থক্য হবে ০।'

অধীর বলল, 'আর আমার মনে হচ্ছে সব সংখ্যা সবসময় সমান হবে।'

জ্যাঠা বললেন, সাবাস, দারুণ বুদ্ধি লাগিয়েছো! কিন্তু এটা কি প্রমাণ করতে পারবে যে অন্য কোনো সম্পর্ক নম্বরগুলোর মধ্যে হতে পারে না? সবাই যে সমান এটাই একমাত্র সম্পর্ক।'

অধীর বলল, সেটা হচ্ছে না। আপনি একটু ধরিয়ে দিন। জ্যাঠা বললেন, আমরা যে অসংখ্য ল্যাটিস পয়েন্টের উপর ধনাত্মক সংখ্যা লিখছি। সেই অসংখ্য সংখ্যাগুলের মধ্যে একটি সর্বনিম্ন সংখ্যা থাকবেই। বলতে পারো, সর্বনিম্ন সংখ্যা এমন এক সংখ্যা যার চেয়ে ছোটো সংখ্যা আর অন্য কোনো ল্যাটিস পয়েন্টের উপর নেই। ধরো, সেই সংখ্যার নাম দিলাম m, তার প্রতিবেশী সংখ্যাগুলো হলো a, b,c,d। এবার $m = (a+b+c+d)/4$ তাহলে $4m=(a+b+c+d)$...(i)। এটা বোঝাই যায় যে (i) হলো চরম সত্য। এবার লক্ষ্য করো, $a \geq m$, $b \geq m$, $c \geq m$, $d \geq m$. যদি এই চারটে অসমতার মধ্যে একটাও স্ট্রিক্ট হয় অর্থাৎ চারটে প্রতিবেশীর মধ্যে যদি m-এর চেয়ে বেশি হয় (সমান না হয়ে) তাহলে $4m<(a+b+c+d)$, যেটা আবার (i)-কে বিরোধ করে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে $a=b=c=d=m$. প্রত্যেক ল্যাটিস পয়েন্টের উপরেই একই সংখ্যা থাকবে, সব সংখ্যা সমান।

আনন্দ বলল, কী সোজা, কিন্তু চোখে এই প্রমাণটা ধরা এত সহজ নয়।

জ্যাঠা বললেন, অনেক সময় দেখবে যে কয়েকটা অঙ্কে সর্বনিম্ন সংখ্যা/পরিস্থিতি বা সর্বোচ্চ সংখ্যা বা পরিস্থিতি ধরে এগোলে সমাধান করা সহজ হয়ে যায়, এটিকে এক্সট্রিমাল প্রিন্সিপ্‌ল্ বলে। চলো, সন্ধ্যা হয়েছে। বাড়ি গিয়ে পড়তে বসো।

মৌনব দাস

নদ-নদী পরিচয়

কংসাবতী নদী

পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় ৬০০ মিটার উঁচু জাবড়বন পাহাড়ে কংসাবতী নদীর উৎপত্তি। বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করে কুমারী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুকুটমণিপুরে দুই নদীর মিলনস্থলে বিখ্যাত কংসাবতী বাঁধ ও জলাধার গড়ে উঠেছে। এরপর রাইপুরের পাশ দিয়ে মেদিনীপুর জেলার বিনপুরে প্রবেশ করেছে। কেশপুরের কাছে কংসাবতী দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটি শাখা দাসপুর এলাকার উপর দিয়ে পালারপাই নামে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণ নদের দিকে এগিয়ে গেছে। অন্য শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২৯

পুংলিঙ্গে

দশরথ:–দশরথ। দশরথস্য–দশরথের।

কস্য পুত্র: রাম: ? দশরথস্য পুত্র: রাম:।

কার পুত্র রাম?- দথরথের পুত্র রাম।

অভ্যাস করি–১

রামের-রামস্য, শ্যামলের-শ্যামলস্য, গোপালের-গোপালস্য, বিজয়ের-বিজয়স্য, মানিকের- মানিকস্য, সঞ্জীবের-সঞ্জীবস্য।

অভ্যাস করি--২

কস্য পুত্র: কুশ: ? –রামস্য পুত্র: কুশ:।

কস্য পুত্র: মেঘনাদ: ?–রাবণস্য পুত্র মেঘনাদ:।

বিঃ দ্রঃ - পুরুষের নামের সঙ্গে ‘এর’ বোঝাতে স্য/স্য হবে। এখন অনুরূপ কয়েকটি বাক্য তৈরি করতে হবে।

ভালো কথা

মাছের কষ্ট

আষাঢ় মাসের বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেল, এখনো বৃষ্টির দেখা নাই। আমাদের পাড়ার একমাত্র পুকুরটার জল শুকিয়ে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। পুকুরের মাছগুলো সকালবেলা খাবি খেতে থাকে। আমরা কাছে গেলেই পালিয়ে যায়, আবার একটু পরেই ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে। আমাদের বাড়ি পুকুর থেকে একটু দূরে। সেদিন বাবা আমাদের কল থেকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে আধঘণ্টা পুকুরে জল দিয়েছে। আমাদের দেখে আরও কয়েকজন ওভাবে জল দিচ্ছে। মাছগুলো মনে হয় একটু স্বস্তি পেয়েছে এখন আর খাবি খাচ্ছে না।

পূর্ণিমা মাহাত, অষ্টমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

নেই যে কারও মন

সায়ণ সেন, একাদশ শ্রেণী, আগরতলা, ত্রিপুরা।

গ্রীষ্মকালে বড্ড গরম
বর্ষাকালে বৃষ্টি নাই
শীতকালেতে একটু শীত
হচ্ছে কেন এমন ভাই!

সবাই বলছে গলছে বরফ
কী যেন বিশ্ব উষ্ণায়ন,
বাঁচতে হলে অরণ্যসৃজন
তাতে নেই যে কারও মন।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

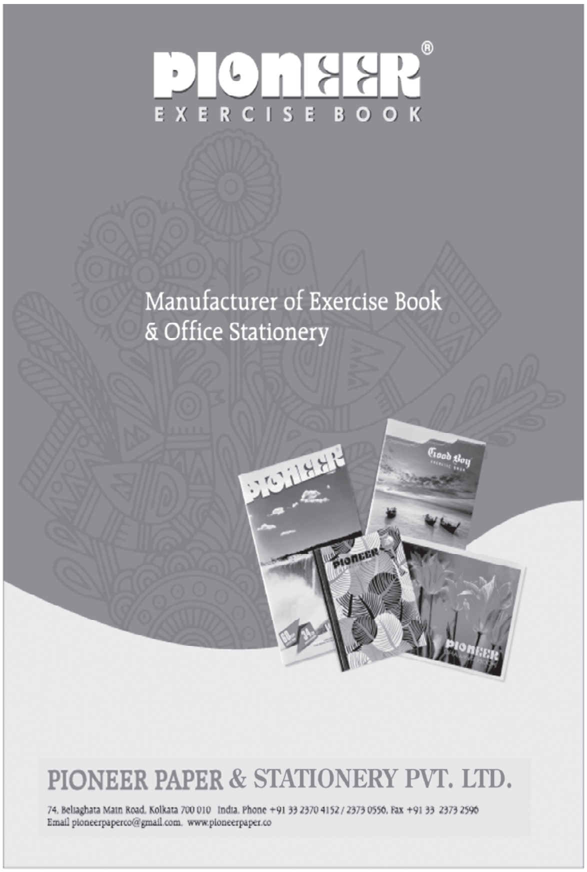

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

দুই মহাকাব্যেই অরণ্যের প্রতি রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা

হীরক কর

অরণ্য বা বৃক্ষজগতের সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ- মহাভারতের সঙ্গে। গত পাঁচ জুন পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ভূমি পুনরুদ্ধার এবং মরুকরণ ও খরার বিরুদ্ধে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০২৪ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস আয়োজন করে সৌদি আরব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ষোড়শ অধিবেশনও ২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সৌদি আরবের রিয়াধে অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি আরব বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪-এর থিম উদ্‌যাপন করবে 'আমাদের ভুমি, আমাদের ভবিষ্যৎ'। এই থিমটি ভূমি ও বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছে। ২০২৫ সালে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস সরকারিভাবে উদ্‌যাপন করা হবে।

অথচ, আমরা এই দেশে অরণ্য-পরিবেশ, এসবকে খুব একটা পাত্তা দিই না। অকারণে গাছ কাটা এখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বিজ্ঞাপনেই সীমাবদ্ধ। যে সরকার বিজ্ঞাপন দেয়, সেই শাসকের মদতেই জলাভূমি ভরাট এবং অরণ্য ধ্বংস নিত্য ঘটনা। কিন্তু 'রামায়ণ', 'মহাভারত' দুটি মহাকাব্যেই অরণ্যের গুরুত্ব এতটাই দেওয়া হয়েছে যে একটা গোটা পর্ব বা কাণ্ডে অরণ্যের প্রসঙ্গটি কাহিনির অঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভারতের যেমন 'বনপর্ব' যেখানে পাণ্ডবদের ১২ বছরের বনবাস জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার রামায়ণে 'অরণ্যকাণ্ডে' এবং 'কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে' শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণ ও সীতা-সহ বনবাস জীবনযাপন ও সেই সঙ্গে অরণ্য জীবনের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক রূপের পরিচয় অনুপম বিবরণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

রামায়ণের যুগে তিন ধরনের বনবাস জীবনের কথা আমরা পাই। এক, শ্রাবণ, যেখানকার জীবনের শ্রী, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পন্নতার ইঙ্গিত পাই। দুই, তপোবন, যেখানে তপস্যায় মগ্ন মনীষীরা সত্যের অন্বেষণে রত। আর তৃতীয় বনবাস জীবনে মহাবনের উল্লেখ পাই। এই মহাবনের বিশাল প্রাকৃতিক অরণ্য পরিবেশের বর্ণনা আছে। যে পরিমণ্ডলে

নানা প্রজাতির প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির বিশদ বর্ণনা পাই আমরা। আবার এই মহাবনের বর্ণনার মধ্যে বনভূমির শোভা-সৌন্দর্যের পাশাপাশি তার অন্তরিন ভয়ালতা বা বিপন্নতার ছবিও আমরা দেখতে পাই। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ বনবাসের সময় রাম একটা জায়গায় পৌঁছে লক্ষ্মণের হাত ধরে বললেন, "বৎস, এই স্থানে বিস্তর পুষ্প বৃক্ষ আছে। যা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিথানে এক সুরম্য আশ্রম নির্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর। উহাতে তরুণ সূর্যের ন্যায় সুগন্ধি পদ্ম সকল পুষ্পিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ওই সেই গোদাবরি। ওই নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নয়। উহা হংস, সারস ও চক্রবাকে শোভিত হয়ে আছে। পিপাসার্ত বহু সংখ্যক মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। এই দেখো কন্দরবহুল পর্বতশ্রেণী উহা অত্যন্ত উচ্চ। ময়ূররা মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে। ওই পর্বতে পর্যাপ্ত সুবর্ণ, রজত ও তাম্র আছে বলিয়া উহা যেন নানামান্য চিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। শাল, তমাল, খর্জুর, পনশ, কাঁঠালগাছ, জল-কদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যনন্দ, চন্দন, কদম্ব, অশ্বকর্ণ, খদির, কিংশুক, পলাশ প্রভৃতি কুসুমিত লতা, গুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইয়াছে। বৎস, এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়। এখানে মৃগ ও পক্ষী যথেষ্ট রয়েছে। অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।"

এই বর্ণনাটি আমরা পাই রামায়ণ মহাকাব্যের 'অরণ্যকাণ্ডে'। 'পিতৃসত্য' পালনের জন্য বনবাসগত রাম সুকুমার পতিব্রতা পত্নী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে মহর্ষি অগস্তের নির্দেশে এই পঞ্চবটি অরণ্যে আসেন। রামের মনে হয়, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল ও ফুলের সম্ভার এবং বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সুরক্ষায় এই বনাঞ্চলটি মানুষের বসবাসযোগ্য করেছে।

রাম ও লক্ষ্মণ ভীমবল পাখি দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন এ নিশ্চয়ই পক্ষীরূপী কোনো রাক্ষস। তাই রাম রাক্ষসজ্ঞানী পাখিকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। জটায়ু তখন প্রফুল্ল মনে রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীতিভাব নিয়ে কোমল মধুর স্বরে বললেন, 'বৎস, আমি তোমাদের পিতার বন্ধু'। সেকথা জেনে রাম নিরাকুল মনে তাঁর নাম ও কুলের পরিচয় জানতে চাইলেন। উত্তরে মহাবল পক্ষী জটায়ু নিজের শুভ নাম ও বংশপরিচয় বিস্তারিতভাবে বললেন। মহামতি জটায়ু বনবাসগত রামকে আশ্বাস জানিয়ে বললেন, 'যদি তুমি ইচ্ছা করো তাহলে আমি তোমার এই বনবাসের সহায় হয়ে থাকি। তুমি ফলান্বেষণে গমন করলে আমি জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করবো'। রাম জানকীর সুরক্ষার দায়িত্ব জটায়ুর হাতে ছেড়ে দিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী রাক্ষসদের বিনাশ করার জন্য এবং অরণ্যের বিঘ্ন নিবারণ করার উদ্দেশে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করলেন।

দীনেশ চন্দ্র সেন 'রামায়ণী কথা'তে লিখেছেন, রাম পিতৃসত্য পালনের ১৪ বছর বনবাসী জীবনযাপনের জন্য 'চিত্রকুট' অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। কেননা এই অঞ্চল অযোধ্যা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রামচন্দ্রের এই অয়ন বা গতিময় যাত্রা স্থান হতে স্থানান্তরে, যেন রামায়ণ কাহিনির অক্ষ। এই যাত্রায় রামচন্দ্র তাঁর অনুগামী অনুজ ও স্ত্রীকে সঙ্গী করে বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে এক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ যেন সমগ্র মানব জীবনেরই এক প্রতীকী রূপ। ধ্যান, জপ, পূজা, হোম-যজ্ঞাদিকর্মে নিত্যনিরত সত্যান্বেষী মুনি ও ঋষিরা শান্ত নির্জন অরণ্য বাতাবরণের প্রত্যাশী। কিন্তু এই আপাত শান্তি ও প্রশান্ত নির্জনতার অন্তরালে ছিল দুর্জন রাক্ষসদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী তীব্র উপদ্রব। বিপন্ন ঋষি ও মুনিরা সমবেতভাবে এসে রামচন্দ্রের কাছে আর্জি জানালেন যে তিনি যেন ওই রাক্ষসদের দুঃসহ উপদ্রব নিবারণ করার উদ্যোগ নেন। শ্রীরামচন্দ্র মুনিদের সেই অনুরোধ রক্ষার্থে সম্মত হলেন। এই যে মহারণ্য, যা একই সঙ্গে তার অযুত বৃক্ষ-লতা-গুল্মের অপরূপ শোভার পাশেই গহন রহস্যময়তা ও ভয়ালতার ঘনঘটা নিয়ে ব্যক্ত; তা যেন জনপদবাসী মানব জীবনেই এক প্রতিসারিত রূপ। এখানে অজস্র বিচিত্র রূপময় বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির বৈভব। অবশ্য তারই সঙ্গে রামায়ণ কাব্য রচয়িতা এই বিপুল অরণ্যভূমির গহন রহস্যময়তার পটভূমি উল্লেখ করেছেন। আর এই পটভূমিতেই জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ প্রভূত পরিশ্রম করে পঞ্চবটীর পর্ণকুটির নির্মাণ শেষ করেন। এই পঞ্চবটীতেই অনেক স্বাচ্ছন্দ্য মনে হয় তিনজনের। মহর্ষি অগস্ত্য অনেক আগেই এই স্থানের ইঙ্গিত করেছিলেন রামকে।

বাস্তবের পাহাড়-পর্বত নদ-নদী আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে মহাকবি বাল্মীকির এই অরণ্যপথের বর্ণনা। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের প্রাকৃতিক অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরা পঞ্চবটিতে সুখেই দিন কেটেছে। এই নিবিড় সুখের দিনেই রাবণের বোন সূর্পণখার আগমন ঘটেছে। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পঞ্চবটীবাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সীতাহরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে রামায়ণ কাহিনি। যা আমাদের যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে। উদ্বুদ্ধ করেছে। □

সাভারকর

এক অদম্য বীরের সংগ্রাম কথা

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

বিনায়ক সাভারকরকে নিয়ে এখন নানা আলোচনা। শতবর্ষ প্রাচীন স্থবির দল কংগ্রেস বীর সাভারকর সম্পর্কে চিরকালই নেতিবাদী অবস্থান নিয়েছে এবং সে পরম্পরা এখনো অব্যাহত। স্বাধীনতার পর বিনায়ক সাভারকরকে নিতান্ত সাধারণ এক নেতার বেশি মনে করার প্রয়োজন কংগ্রেস করেনি। অবশ্য সে তার কায়েমি নীচ রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই।

অথচ জন্ম থেকেই বিনায়ক ছিলেন নেতা। বিদ্যালয়ে সহপাঠীরা তাঁর স্বাভাবিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। চাপেকার ভাই দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব— প্লেগ কমিশনের মি. রান্ড এবং এক ইংরেজ অফিসার মি. অয়ার্স্টকে গুলি করে হত্যা করে ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিলে, ষোলো বছরের বিনায়ক দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের নীরব কঠিন প্রতিজ্ঞা করেন। এই অয়স্কান্ত মনোভাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ক্ষুরাধার বুদ্ধির সাভারকর ১৯০৬ সালে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। ইংল্যান্ডে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সম্মোহিত হয়েছিলেন ভাই পরমানন্দ, লালা হরদয়াল, মাদাম কামা, মদনলাল ধিংড়া প্রমুখ।

লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটিতে বিনায়ক আগুন ঝরা বক্তব্য রাখতেন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত আইসিএস বঙ্গপ্রদেশের এম.কে. হালদার তখন ইংল্যান্ডে অধ্যায়নরত। নিখুঁত সাহেবি পেশাকে আচ্ছাদিন হালদারকে খর্বকায় এক তেজোদীপ্ত ভারতীয় তরুণ সরাসরি বলেছিলেন যে হালদার যদি ভারতীয় হন তাহলে সেই তরুণের বক্তব্য শুনে চোখ থেকে জল নয়, অগ্নি বর্ষণ করা উচিত ছিল। তরুণটি হলেন সাভারকর।

সাভারকর জন্ম থেকেই ভয়হীন। ইংল্যান্ডে থাকার সময় গোপনে তিনি এদেশে আগ্নেয়াস্ত্র পাঠাতেন। মদনলাল ধিংড়া ইংল্যান্ডে কার্জন উইলিকে গুলি করে হত্যা করেন ১ জুলাই। আর ৫ জুলাই লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে আগা খাঁ-র সভাপতিত্বে এক সভায় সর্বসম্মত ভাবে ধিংড়ার আচরণের নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ করা চলছিল। একটি মাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠ সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত করেছিল— ‘এই নিন্দা সর্বসম্মত নয়। আমি বলছি। আমার নাম সাভারকর।’ বিনায়কের কম্বুকণ্ঠের এই আগুনঝরা প্রতিবাদ শুনে সভাস্থলে থাকা মানুষদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক শুরু হয়। লন্ডনে দাঁড়িয়ে সাভারকরের এই কপটতাহীন প্রতিবাদ ভারতে বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে রহস্যময় ভাবে ধিংড়ার আত্মবলিদান সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চুপ!

নানা সশস্ত্র ষড়যন্ত্র, বিপ্লবী বই লেখার জন্য ইংল্যান্ডেই সাবারকর চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১০-এর ১ জুলাই এসএস মোরিয়া জাহাজে সাভারকরকে বন্দি করে ভারতে আনার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে ফ্রান্সের মার্সেলস বন্দরে ৭ জুলাই জাহাজ নোঙর করে। ভোর রাতে বিনায়ক জাহাজের শৌচাগারের পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। ব্রিটিশ নিরাপত্তারক্ষীরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করলেও জলে ডুবে, সাঁতরে তিনি ফরাসি স্থলভূমিতে ওঠেন। ব্রিটিশ নিরাপত্তারক্ষীরা ফরাসি পুলিশকে উৎকোচ দিয়ে আন্তর্জাতিক

রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে সাভারকরকে বন্দি করে ২২ জুলাই, ১৯১০-এ বোম্বাই এনে নাসিক জেলে পাঠায়। সাভারকরের এমন দুঃসাহসী আচরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন তৈরি করে। এদেশে বিপ্লববাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯১১ থেকে ১৯৬০ অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর তাঁর দ্বীপান্তর হয় দুটি মামলায়।

কেমন ছিল আন্দামানে তাঁর দিনগুলি? এক কথায় বিষময়। আধ্যাত্মিক অসহযোগের প্রবক্তা গান্ধী বা বুকে গোলাপ গোঁজা শৌখিন স্বাধীনতার পূজারি নেহরুর মতো রম্য পরিবেশের জেলখানা ছিল না তাঁর। তাঁকে চোর, ডাকাত, দাগি আসামি পরিপূর্ণ এসএস মহারাজ জাহাজে আন্দামান নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যারিস্টার সাভারকরকে সেলুলার জেলের ৭নং সেলে দুর্ধর্ষ পাঠানদের পাহারায় রাখা হয়। জেলে প্রথমে নারকেল দড়ি তৈরি করতে হতো। এরপরে দিনে দশ কেজি নারকেল তেল ঘানি ঘুরিয়ে বের করতে হতো। চরম দুরবস্থায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় চিঠি দিয়ে তাঁর বি.এ. ডিগ্রি বাতিল করে। জেলের মধ্যে অবশ্য এই বিপ্লবী চুপ করে ছিলেন না। জেলের মধ্যেই পাঠানদের প্ররোচনায় ধর্মান্তরিত হওয়া হিন্দু কয়েদিদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনেন। জেলে কাঠকয়লা বা ইটের টুকরো দিয়ে লিখেছিলেন আটত্রিশ হাজার লাইন কবিতা। আন্দামানের বন্দিরা তা মুখস্থ করে দেশে ফিরে ছড়িয়ে দিতেন। ছোটো ভাই নারায়ণ কবিতাগুলো 'জনৈক মারাঠা' ছদ্মনামে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। হিন্দু কয়েদিদের তিনি জাতিভেদ প্রথা থেকে মুক্ত করেন আন্দামানের কারাবাসে।

দীর্ঘ দশ বছরের বেশি আন্দামানের নরক যন্ত্রণা সহ্য করেও মানসিক শক্তি তিনি হারাননি। এই ত্যাগ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই তুলনীয়। অথচ দেশের বিকৃত ইতিহাসে বীর সাভারকরের এই ত্যাগ কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে গান্ধী, নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদদের মতো নেতাদের মতো জেল-প্যালেস তাঁর কোনোদিন জোটেনি। ব্রিটিশ জেলে বন্দি না থেকে প্রকৃত এই দেশপ্রেমিক মুক্তি চেয়েছিলেন পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য। তাঁরা তিন ভাই-ই ইংরেজ শাসন বিপুল ভাবে অত্যাচারিত। সাভারকর আরও বৃহৎ কাজের জন্যই মুক্তিলাভ করতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে জেল থেকে মুক্তি পেলে তাঁর কার্যকলাপ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও স্তব্ধ হয়নি। কী বিপুল সাহস আর আত্মশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। মুসলমান নেতা বিশালাকায় সৌকত আলিকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত খর্বকায় শিবাজীর হাতে বিপুলবপুর আফজল খাঁর পরিণতি। বলাবাহুল্য, সৌকত আলি নীরব প্রস্থানই আত্মরক্ষার সেরা পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

সাভারকরের মানসিক দৃঢ়তার আর একটা পরিচয় নেওয়া যাক। ফ্রান্সের মার্সেলস বন্দর থেকে জাহাজ থেকে দুঃসাহসিক নিষ্ক্রমণের পর পুনরায় ধৃত হলে জাহাজ রক্ষীরা তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করতে থাকে। সাভারকর দৃঢ়স্বরে বর্বর রক্ষীদের সতর্ক করে বলেন যে নিজের জীবনের মায়া তাঁর কণামাত্র নেই। কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি হতে হবে নিগ্রহকারীদের। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও ঘরে আগুন লেগেছে বলে বহ্নিশিখায় বাকিদের পোড়াতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না। শত্রুবেষ্টিত সাভারকরের এমন সতর্কবাণী শুনে নিরাপত্তারক্ষীরা প্রমাদ গুণে তাঁর সঙ্গে সুব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

আন্দামান প্রত্যাগত সাভারকরকে যখন রত্নগিরিতে অন্তরীন করা হয় তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। দেশ ভাগে গান্ধীর ভূমিকায় এ সময় তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। নাথুরাম গডসের গুলিতে গান্ধীর মৃত্যু হলে কংগ্রেস পুরোনো খেলা শুরু করে। নাথুরাম গডসে, নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে, বিষ্ণু করকরে, মদনলাল পাহোয়া, গোপাল গডসে, শঙ্কর কিস্তায়া, ডাঃ দত্তাত্রেয় পার্চরের সঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই পি.আর. দাশ স্বেচ্ছায় সাভারকরের পক্ষে সওয়াল করেন। সাভারকর গান্ধী হত্যার দায় থেকে মুক্তি পান।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্পর্কে অবশ্য শ্রদ্ধায় নতজানু হতেন অনেকে। ১৯৭১-এ বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীর ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ' নিজের অভিনন্দন সভায় বলেন—

'১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনার বিজয় সংবাদ পেলে বীর সাভারকর নিশ্চয় আমাকে পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করতেন। তা হতো আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান। এ সম্মান পেলে আমি কৃতার্থ হতাম।'

রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, বলরাজ মাধোকদের মতো স্বার্থহীন ব্যক্তিত্বরা বীর সাভারকর সম্পর্কে ছিলেন সশ্রদ্ধ। দীর্ঘ কংগ্রেসি রাজত্বে তাঁকে বিস্মৃত করার অপচেষ্টা নিতান্তই পরিহাস মাত্র। ১৯৬৬-র ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করা এই আপোশহীন মহান বীর ভারতীয়ত্ব, রাষ্ট্রীয়ত্ব ও সদর্থক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ব্রিটিশ আমলে লুঠ হওয়া প্রত্নসামগ্রী ভারতকে ফেরত দেবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ৫০০ বছর প্রাচীন ব্রোঞ্জ-নির্মিত একটি মূর্তি ভারতকে ফিরিয়ে দিতে চলেছে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মূর্তিটি দক্ষিণ ভারতীয় সন্ন্যাসী ও সাধক তিরুমাঙ্গাই আলোয়ারের। ব্রিটিশ শাসনে প্রাচীন ভাস্কর্যের এই নিদর্শনটি ভারত থেকে লুঠ হয়। ব্রোঞ্জ মূর্তিটির উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামে মূর্তিটি এতদিন প্রদর্শিত ছিল। ব্রিটেনের ভারতীয় হাইকমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে ষোড়শ শতকে নির্মিত এই মূর্তিটি তামিল সন্ন্যাসী আলোয়ারের। এই হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন একজন অসাধারণ কবি। তাঁর কাব্যপ্রতিভার জন্য তিনি ‘নারকাভি পেরুমল’, ‘পরাকালা’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দির থেকে আলোয়ারের এই মূর্তিটি ব্রিটিশরা লুঠ করে।

অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের তরফে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে ষোড়শ শতকের থিরুমাঙ্গাই আলোয়ারের ব্রোঞ্জ মূর্তিটি ফেরতের বিষয়ে ভারতীয় হাইকমিশনের তরফে উত্থাপিত দাবিটি গত ১১ মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলের তরফে সমর্থিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলের তরফে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত এবার চ্যারিটি কমিশনে প্রেরিত হবে।

নাইজেরিয়ার তরফে অনুরোধ আসার পর ২০২২ সালে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে বেনিন ব্রোঞ্জের প্রত্ননিদর্শন সমূহ তারা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। তাদের সেই সিদ্ধান্তের পরেই ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিটির ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় বলে খবর। ১৮৯৭ সালে দক্ষিণ ভারত থেকে ২০০-রও বেশি প্রত্নসামগ্রী লুঠ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। এছাড়াও ব্রিটিশ হাজার হাজার পিতলের সামগ্রী ও প্রত্ননিদর্শন ভারত থেকে নিয়ে যায় ও সেই মিলিটারি মিশনের খরচ তোলার জন্য লন্ডনে সেইগুলি বিক্রি করে। ১৮৪৯ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের পঞ্জাব থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোহিনুর হিরেটি ব্রিটেনে নিয়ে যায় এবং সেই হীরেটি রানি ভিক্টোরিয়ার রাজমুকুটে স্থান পায়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর একাধিক বার সেই রত্নটি ফেরতের দাবি জানিয়ে এসেছে।

প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ পেলেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীর (কার্তিক মহারাজের) নিরাপত্তার দায়িত্বে এখন থেকে থাকবেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর চার জওয়ান। লোকসভা নির্বাচন শেষের পর গত ৯ জুন তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হলো বিশেষ নিরাপত্তার। এই বিষয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, ‘সন্ন্যাসী হিসেবে আমার নিরাপত্তাহীনতা কিংবা বাড়তি নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন বা লালসা নেই। কিন্তু আমার আশ্রমে দু’হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী আছে। তাঁদের কথা ভেবে নিরাপত্তার আবেদন করেছিলাম। সেটা মঞ্জুর হয়েছে’।

লোকসভা ভোটের মধ্যে গত ১৮ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগের সভা থেকে সরাসরি কার্তিক মহারাজের নামোল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে অনেক সম্মান করতাম, কিন্তু যে লোকটা তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেন না, তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ, সে ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছে’। মমতা এও বলেন, ‘সব সাধু সমান হয় না। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি আইডেন্টিফাই করেছি বলেই বলছি’। মুখ্যমন্ত্রীর এই হিংসাত্মক ও কুরুচিকর মন্তব্যের পর নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কার্তিক মহারাজ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে হামলা হতে পারে। আশ্রম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে একটি হুমকি চিঠিও তাঁর কাছে এসেছে বলে আদালতে জানিয়েচিলেন কার্তিক মহারাজ। ভোট শেষের এবার তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো। এখন থেকে মহারাজের নিরাপত্তায় থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর চার জন জওয়ান।

দেশ জুড়ে বলবৎ হলো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১ জুলাই দেশ জুড়ে বলবৎ হলো নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন— ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ১৮৬০' বা আইপিসি, 'দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর, ১৯৭৩' বা সিআরপিসি ও 'দ্য ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২'— এই তিনটি পুরনো আইনের পরিবর্তে প্রযোজ্য হবে নতুন তিনটি আইন। ২০২৩-এর আগস্টে এই তিনটি নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংসদে তিনটি বিল উপস্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। উপস্থাপনের পর ৩১ সদস্যের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পর্যালোচনার জন্য বিলগুলি প্রেরিত হয়। এই স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজ লাল। এই বিষয়ে সব পক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের মত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে গত বছরের ৭ নভেম্বর সংসদীয় কমিটি এই বিলগুলি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে। এই বিলগুলিতে ৫০টিরও বেশি পরিবর্তন ও সংশোধনের সুপারিশ করে কমিটি। ২০২৩-এর ১২ ডিসেম্বর তারিখে সংশোধিত এই তিনটি বিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে পেশ করেন। এরপর বিলগুলি সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলেও ২০২৪ সালের ১ জুলাই হতে এই তিনটি আইন দেশ জুড়ে বলবৎ করার কথা ঘোষিত হয়। নতুন তিনটি আইন বলবৎ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ১ জুলাইয়ের আগে সংঘটিত অপরাধের মামলাগুলির বিচার পুরনো বিধি অনুযায়ী চলবে। আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে নতুন আইন সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত কার্যপ্রণালী তৈরি সম্পূর্ণ হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন।

পুরনো আইনে গণপিটুনি রোধে কঠিন দণ্ডের সংস্থান ছিল না। গণপিটুনির বা মব লিঞ্চিঙের অপরাধ প্রমাণিত হলে ঘটনার গুরুত্ব বিচারে নতুন আইনে রয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের সংস্থান। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে দিনের পর দিন হয়ে চলেছে বীভৎস গণপ্রহারের ঘটনা। তার একের পর এক উদাহরণ প্রতিনিয়ত সামনে আসছে। নতুন তিনটি আইন সংসদে প্রণীত হওয়ার পর তার প্রয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ও জেহাদিদের বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী সচেষ্ট হলেও দেশ জুড়ে বলবৎ হওয়া এই তিনটি আইন ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম বা ভারতীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে এবং ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ভবিষ্যতে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষায় কার্যকরী হয়ে উঠবে বলেই তথ্যভিজ্ঞ মহলের মত।

একটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে নতুন আইন অনুযায়ী প্রথম এফআইআর রুজু হয়েছে। সেন্ট্রাল দিল্লির কমলা মার্কেট এলাকায় জনগণের চলার পথে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে একজন বিক্রেতার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় নতুন আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের হয়। নতুন আইনে পুলিশকে প্রদত্ত 'প্রভিশন্স অফ রিভিউ' (অনুসন্ধান পরবর্তী পর্যালোচনার সংস্থান) অনুযায়ী প্রাথমিক তদন্তের পর শেষ পর্যন্ত অভিযোগটি দিল্লি পুলিশ দ্বারা গৃহীত হয়নি।

পানাগড়ের পর এবার নবদ্বীপের মায়াপুর থেকে জঙ্গিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২২ জুন বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগ রাখার অভিযোগে কাঁকসা থানার পানাগড় মীরে পাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ হাবিবুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। কাঁকসা থানায় ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে এসটিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এরপর নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থেকে জঙ্গি যোগে গ্রেপ্তার হয়েছে হারেজ শেখ নামের এক যুবক। মহম্মদ হাবিবুল্লাহ মানকর কলেজের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগ খুঁজে পান এসটিএফ কর্তারা। বাংলাদেশের এই জঙ্গি সংগঠনের ভারতীয় ইউনিটের নাম হলো— শাহাদাত। শাহাদাত সংগঠনটির আমির ছিল হাবিবুল্লাহ। তার বাড়ি থেকে ল্যাপটপ ও মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তাকে তোলা হলে হাবিবুল্লাহকে ১৪ দিনের হেফাজতে পায় এসটিএফ। এসটিএফ কর্তারা এরপর নবদ্বীপ থানার মায়াপুর থেকে হারেজ শেখকে গ্রেপ্তার করেন। হারেজ শাহাদাতের আমিন (চিফ অফ অপারেশনস্) পদে ছিল বলে খবর। গত ২৫ জুন তাকেও দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

২৭ বছর বয়সি হারেজ শেখের সঙ্গে মহম্মদ হাবিবুল্লাহর কীরকম যোগ ছিল তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে এসটিএফ। বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ‘পানাগড়, বারুইপুর, সোনারপুর বারবার এরকম ঘটনা আমরা দেখছি। এটা প্রথমবার নয়। এটা জঙ্গি সংগঠনগুলোও জানে যে, তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গ। এখানকার পুলিশ তাদের বিরক্ত করে না। তাই তো দেশে ধৃত জঙ্গিদের কোনো না কোনো ভাবে পশ্চিমবঙ্গ-যোগ সামনে আসছে।’

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী তথা সকলের প্রেরণা স্বরূপ হরিপালের প্রিয় মাস্টারমশাই নিমাই চন্দ্র দাস গত ১৪ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তার স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি ভারতীয় কিষাণ মোর্চার হুগলি জেলার সভাপতি রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ২০০১ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির হরিপাল ব্লকের সভাপতি হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর অসংখ্য ছাত্রকে স্বয়ংসেবক করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় কিষাণ মোর্চা, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গভীর শোক প্রকাশ করেন। বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শেওড়াফুলির হাতিশালা ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। গত ২৭ জুন তাঁর বাড়িতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী এবং দক্ষিণবঙ্গ গ্রাম সেবা প্রমুখ দুলাল নস্কর উপস্থিত হয়ে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

* * *

হাওড়া জেলার ডোমজুড় নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক হারাধন ভট্টাচার্য গত ২৬ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও পরে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব অতি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। ডোমজুড় মহকুমা সঙ্ঘচালক, হাওড়া জেলা সঙ্ঘচালক, হুগলি বিভাগ সঙ্ঘচালক ছাড়াও বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রান্তের সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

* * *

গত ২৬ জুন হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নিবাসী সর্বমঙ্গলা দলপতি হৃদয়াঘাতে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দির, তাঁতিবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, আচার্য্য প্রমুখ পদে কর্মরতা ছিলেন। সারদা শিশু মন্দিরের সূচনাকাল থেকেই আচার্য্যার দায়িত্ব অতি দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর স্বামী হরিপদ দলপতি এক সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উলুবেড়িয়া নগর প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

গত ২৫ জুন কলকাতায় বাগবাজার নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক অসিত পোড়ে (ভোগী দা) হৃদয়াঘাতে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ভোগীদা ছিলেন বাগবাজারে নিবেদিতা প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক। ১৯৮২ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। কয়েক বছর পরে শাখার মুখ্য শিক্ষক, কার্যবাহ, প্রভাত বিভাগ কার্যবাহ এবং পরবর্তী সময়ে নগরের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোগীদা শ্যামপুকুর মিলনে যেতেন। সদাহাস্য ও প্রাণোচ্ছল মানুষটি কলকাতা মহানগরের সারদা নগরের প্রত্যেক স্বয়ংসেবকদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন।

গত ৩০ জুন বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে স্বর্গীয় ভোগীদার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।

তালিবানি কায়দায় যুবক-যুবতীকে রাস্তায় ফেলে প্রহার, রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি এক বর্বরোচিত ঘটনার সাক্ষী থাকলো রাজ্যবাসী। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে, প্রকাশ্য দিবালোকে এক যুগলকে রাস্তায় ফেলে লাঠির গোছা দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে এক ব্যক্তি। আর এই ঘটনাটি গোল করে দেখছে পথ চলতি কৌতূহলী সাধারণ মানুষ। অথচ এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ করে একজনকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এমনকী ঘটনাস্থলের আশপাশে ইতি-উতি পুলিশ দেখা গেলেও তারাও এগিয়ে আসেনি। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি এক মহিলা ও একটি যুবককে পেটাচ্ছে এবং বেদম প্রহারে আহত ওই যুগল রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেও ফের তাদের তুলে পেটানো হচ্ছে।

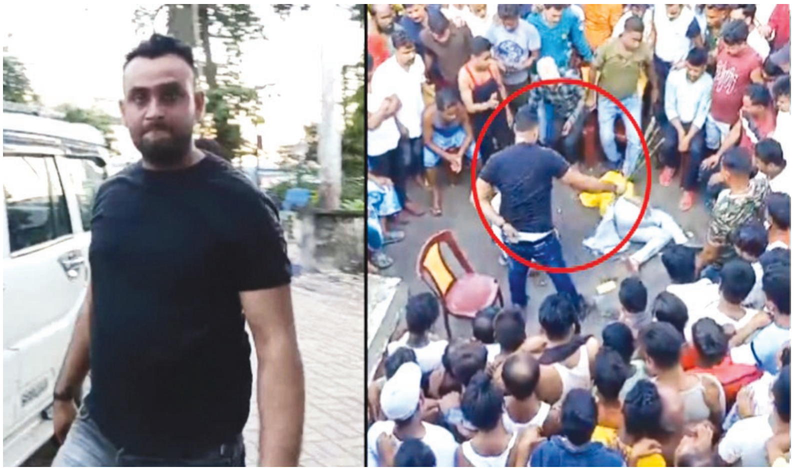

তালিবানি কায়দায় এই অমানবিক ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে যায় সামাজিক স্তরে। ঘটনার দু'দিন পর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন সমালোচনার ঝড় উঠতে শুরু করে বেগতিক দেখে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন এবং স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে অভিযুক্ত তাজিমুল নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘলগাঁও এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ওই যুবক-যুবতীর মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই অভিযোগেই ওই দু'জনকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়। এদিকে এই ঘটনা কথা জানাজানি হতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় খবর প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় সামাজিক স্তর থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে। জানা গেছে, অভিযুক্ত তাজিমুল ওরফে জেসিবি। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ। ইসলামপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের ঘনিষ্ঠ তাজিমুল। এই ঘটনা খবর পেয়েই পুলিশ তদন্তে নেমে তৃণমূল বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তাজিমুল ওরফে জেসিবিকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে।

এদিকে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মূল অভিযুক্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুদিন কেন সময় লাগলো তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করে। এই ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, এই রাজ্যে এখন তালিবানি প্রশাসন চলছে। আইন কানুন বলে কিছু নেই। সব কিছুই গুন্ডা-মাফিয়াদের হাতে চলে গিয়েছে। অন্যদিকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম তার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, তৃণমূলের শাসনকালে সালিশি সভায় বিচার করে ওই দলের গুন্ডা মাফিয়ারা। স্থানীয় সূত্রের খবর, তাজিমুল তৃণমূল কর্মী এলাকায় যে সমাজ বিরোধী হিসেবে পরিচিত। এই এলাকার বিধায়কের ছত্রছায়ায় থেকে সে নানা অসামাজিক কাজ করে। অন্যদিকে জেলা পুলিশ সুপার জবি টমাস এই ঘটনার ব্যাপারে জানান, ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পারিনি। পরে সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়তেই আমাদের নজরে আসে এবং পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং নির্যাতিতদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত তাজিমুল জেরায় জানিয়েছে, নিগৃহীত ওই তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল, স্থানীয়দের অভিযোগে ভিত্তিতে ওই দুজনকে একটু মারধর করা হয়।

অন্যদিকে রাজ্যে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনা বেড়ে চলেছে। কখনও চুরির অভিযোগ, কখনও ছেলে ধরা অভিযোগে গণপ্রহারের ঘটনা ঘটছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে, নদীয়া জেলার চাকদহ ব্লকের দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াডাঙ্গা এলাকায়। এখানে দুই মহিলাকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় মানুষ ওই মহিলাদের আটক করে মারধর শুরু করে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ওই দুই মহিলাকে উদ্ধার করে।

এদিকে ইসলামপুরে তরুণ-তরুণীকে রাস্তায় ফেলে মারার ঘটনা প্রসঙ্গে চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, ওই মহিলাটি তার স্বামী-সন্তানকে ছেড়ে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জন্য ওই যুবকের কাছে চলে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে। এই খবর পেয়ে তাজিমূল সেখানে গিয়ে সামান্য চড়-থাপ্পড় মেরে থাকতে পারে।